শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

(তৃতীয় সংস্করণ)

১৯১৪

মূল্য ১৲ এক টাকা

উপহার

স্বামিন্‌

সংসারের অন্ধকার ঝটিকা পীড়নে
যখনি কাতর দেহ, অবসন্ন প্রাণ,
প্রীতিদীপ্ত পুণ্যরূপে নয়ন ভরিয়া
দাঁড়াও সমুখে দেব, কর শান্তি দান!
প্রেমের পরশে তব দলিত হৃদয়,
নবীন জীবন লভে, ফুলে ফুলময়!
স্বর্গের প্রভাত তুমি প্রশান্ত বিমল।
বিধাতার মূর্ত্তিমান্‌ আশীষ মঙ্গল!
তোমারি প্রসাদ এ যে তোমারি কল্যাণ—
তোমারে করিনু আজি উপহার দান।

সূচী

নবকাহিনী

কুমার ভীমসিংহ

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

(১)

মিবারের রাণা রাজসিংহ একাকী বিশ্রামকক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে, মহারাজের আদেশে ভৃত্যেরা একটি দীপ মাত্র প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া গৃহের অন্য দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে মৃদু-আলোকে প্রশস্ত গৃহে এমন একটি স্নিগ্ধতা আনিয়া ে লিয়াছে যে, তাহাতে স্নাত হইয়া মহারাজের এতক্ষণকার স্তাগুলিও ক্রমে স্নিগ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছে। কুমার য়সিংহের রাজ্যাভিষেকের দিন নিকটে,—প্রজারা এ .টনাটি কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে, একথা আর তাঁহার মনে নাই। উৎসবের দিন সকলের কিরূপ আনন্দ

হইবে, সকলের অর্থাৎ জয়সিংহের মাতার সেদিন কিরূপ হর্ষের উচ্ছ্বাস বহিবে, জয়সিংহ কিরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবেন—অন্য কথা ভুলিয়া মহারাজ এখন কেবল এই রকম কথাই ভাবিতেছেন। হঠাৎ গৃহদ্বারটি অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া গেল, মহিষী কমলকুমারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া রাজা যেন বিস্মিত হইলেন, তটস্থ ভাবে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, তাঁহাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহিষী পার্শ্বে আসিয়া বসিলে বলিলেন—"একি! এ সময়ে যে?"

মহিষী বলিলেন—"না আসিয়া কি করি? ডাকিলে ত আর দেখা পাই না"।

রাজা একটু অপ্রস্তত হইলেন; আজ দিনের মধ্যে দুই তিন বার মহিষী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন—তাহা মনে পড়িয়া গেল; আস্তে আস্তে বলিলেন—"মহিষি, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

মহিষী মনে মনে বলিলেন—"আমার কপাল ক্রমে অনেক দিন ভুলিয়াছ—সে কি আজ নূতন!"—কিন্তু মুখে আর সে কথার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। যা গুজব উঠিয়াছে, তাহা কি সত্য?"

একেবারে ঠিক উত্তরটা দিতে মহারাজের বাধিয়া গেল, বলিলেন "কি গুজব?"

মহিষী। "শুনিতেছি, তুমি থাকিতে তোমার সিংহাসন জয়সিংহ অধিকার করিবে, কথাটা কি সত্য? তাহা হইলে এ যে দেখিতেছি মুসলমানের রাজ্য হইয়া পড়িল!"

জয়সিংহের প্রতি এ কটাক্ষটা রাজার ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন—"কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। জয়সিং সিংহাসন অধিকার করিতেছে না, আমার সিংহাসন আমি তাহাকে দান করিতেছি"।

মহিষী একটু তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দিতেছ? ইহারি মধ্যে? কেন এত শীঘ্র বনে যাইবার সময় হইয়াছে কি?"

রাজা উৎসারিত ক্রোধ সবলে দমন করিয়া বলিলেন—"মহিষি, ইহাতে হাসির কিছুই নাই, রাজা হইলে অনেক বিবেচনা করিয়া, অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হয়। ভাবিয়া দেখ, রাজার উপর কত শত পরিবারের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমি থাকিতে থাকিতে রাজ্যের একটা বন্দোবস্ত করিয়া না গেলে, শেষে এই অধিকার লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বাধাইয়া রাজ্য ছারখার করিয়া তুলিবে"।

মহিষী। "কিন্তু আমি ত বুঝিতেছি, তুমি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ মিটাইতে গিয়া বিবাদের স্থত্রপাত করিয়া দিতেছ, রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া রাজ্য ছারখার করিবারই

পথ প্রস্তুত করিতেছ। তুমি থাকিতে যদি পুত্রকে রাজা করাই বিধেয় মনে কর, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা না কর কেন? তাহার ন্যায্য অধিকার অন্যায়রূপে হরণ করিয়া, সে সিংহাসনে কনিষ্ঠকে বসাও কি বলিয়া?"

কথাগুলি বড় সত্য, কিন্তু রাজার শুনিতে ভাল লাগিল না। অনেক সময় সত্য কথা শুনা বড় কষ্টকর। রাজা বিরক্ত ভাবে বলিলেন—"ভীমসিংহ ও জয়সিংহ এত অল্প সময়ের ছোট বড়, যে সেজন্য জ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীমসিংহ রাজ্যে দাবী করিতে পারে না। দুইজনে একই দিনে জন্মিয়াছে, একই সময়ে জন্মিয়াছে বলিলেও বেশী বলা হয় না; এরূপ স্থলে তাহাদের মধ্যে যে যোগ্য অধিক, তাহারই রাজ্যে অধিকার। আমি জয়সিংহকেই অধিক উপযুক্ত মনে করি।"

রাণী হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দেখিতেছি কালের নিয়ম উল্টাইয়া ফেলিতে চাও, নহিলে ছোটকে ছোট না বলিয়া সমান বলিবে কেন? সুখের মধ্যে তোমার কথায় কালের নিয়ম ভাঙ্গিবে না। এক দণ্ড দূরে থাক, এক মুহূর্ত্ত আগেও যে জন্মিবে, সেও বড়র অধিকার লইয়াই জন্মিবে। লব কুশ ত যমজ ভ্রাতা, তবে কুশই কেন পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইলেন? আর জিজ্ঞাসা করি—মহারাজ, জয়সিংহ ভীমসিংহ হইতে উপযুক্তই বা কিসে? শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বুদ্ধিতে, সাধুতায় কিসে ভীমসিংহ

জয়সিংহের উপরে? কাহার সাহসে সৈন্যগণ বশীভূত? সভাসদেরা কাহার ব্যবহারে মুগ্ধ? প্রজারা কাহাকে তাহাদের রাজা রূপে বরণ করিতে চায়? সকলকে জিজ্ঞাসা কর, কে উপযুক্ত শুনিতে পাইবে। তবে যদি তোমার প্রিয়মহিষীর পুত্র ও প্রিয় পুত্র বলিয়া জয়সিংহ উপযুক্ত হয় ত বলিতে পারি না!"

এই বিদ্রূপ রাজার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইল—তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তবে তাই"।

রাণীও ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন —"ওকথা তবে স্পষ্ট না বলিয়া পাঁচ রকম কথার ভাণ কর কেন? রাজা হইয়া সত্য কথা বলিতে ভয় হয় নাকি"?

রাজা বলিলেন—"কে আমাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে আর আমি তাহার কাছে সত্য লুকাইয়াছি?"

মহিষী বলিলেন—"কুমারদের জন্ম দিনের কথা মনে পড়ে কি?" বলিতে বলিতে মহিষীর কথা বাধিয়া গেল, আর বলিতে পারিলেন না, মুহূর্ত্তে বিশ বৎসর যেন পিছাইয়া পড়িল, তখনকার ঘটনা নূতন হইয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই দিনের সরলা, বিশ্বস্তহৃদয়া, অভিমানিনী বালিকা-বধূতে আর আজিকার এই প্রৌঢ়া, স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা, দলিতপ্রাণা রাজরাণীতে কত প্রভেদ!

আজিকার এ মর্ম্মাহত, গর্ব্বিত কমলকুমারী নহেন—সেদিন যেন আর এক কমলকুমারী—নবপ্রসূত সন্তান ক্রোড়দেশে লইয়া—প্রেমপূর্ণ উৎসুক হৃদয়ে স্বামীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রসবের যন্ত্রণা আর তাঁহার মনে ছিল না, পুত্রমুখ দেখিয়া স্বামী কত না আহ্লাদিত হইবেন—কিরূপ উৎফুল্ল হৃদয়ে নাজানি তিনি নব শিশুকে ক্রোড়ে লইবেন—এই ভাবিয়া হৃদয়ে সুখের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন পল গেল, দণ্ড গেল, স্বামী আসিলেন না, তখন সে সুখ কষ্টে পরিণত হইল, মহিষী ম্রিয়মাণ, কাতর হইয়া পড়িলেন। দুই দণ্ড পরে একজন দাসী আসিয়া বলিল—"রাণী চঞ্চলকুমারীর এই মুহূর্ত্তে এক পুত্র হইল, মহারাজ তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দিতেছেন। সেইখান হইতে এখানে আসিবেন।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দেওয়া মিবাররাজকুলপদ্ধতি। ইহাদ্বারা পিতার, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার ভবিষৎ-উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হয়। কমলকুমারী যখন শুনিলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে অন্যায়রূপে কনিষ্ঠের পায়ে তিনি সেই কবচ বাঁধিয়াছেন—তখন তীব্র কষ্টে তাঁহার হৃদয় জলিয়া উঠিল, মাতার অশ্রুজলে সেদিন নবশিশুর প্রথম অভিষেক হইল। মহিষী সেই প্রথম বুঝিলেন, স্বামীর হৃদয়ে আর তাঁহার স্থান নাই, স্বামী তাঁহাকে ভালবাসেন না।

আগে কখন কখন মনে এরূপ সন্দেহ যে আসে নাই, তাহা নহে; কিন্তু নিমেষে তাহা চলিয়া গিয়াছে, এবং সেই সন্দেহের জন্য আপনাকে দোষী ভাবিয়া শেষে আপনাকেই তিরস্কার করিয়াছেন—কিন্তু আজ সে সন্দেহ সত্যরূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, মর্ম্মাহত হইয়া মহিষী মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। স্বামী যখন পুত্রকে দেখিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কমলকুমারী একটি কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া উঠিল। ইহার কিছুদিন পরে একটা গুজব শুনিলেন যে, মহারাজ জানিয়া শুনিয়া কনিষ্ঠকে কবচ পরান নাই, ভৃত্যদের কথার গোলমালে চঞ্চলকুমারীর পুত্রই অগ্রে জন্মিয়াছে বুঝিয়া ভুলক্রমে তাহাকে কবচ পরাইয়াছেন। একথা সত্য কি না, তাহা কিন্তু কমল-কুমারী এপর্য্যন্ত কখনও রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। যাহার ভালবাসায় বিশ্বাস নাই, যাহার কাছে গেলে নূতন কষ্টের কারণ পাইয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে, তাহাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে মনের বল থাকে কি? যতবার তিনি একথা তুলিতে গিয়াছেন, তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছে যে, ততবারই তিনি সে কথা অন্য দিনের জন্য রাখিয়া অন্য কথা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এতদিন পরে যখন কবচবন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না, যখন শুনিলেন সত্যই জয়সিংহকে মহারাজ

সিংহাসন দিতেছেন, তখন আর তাঁহার স্ত্রীর অভিমান মনে রহিল না, তখন তাঁহার কেবল মনে রহিল তিনি ভীমসিংহের মাতা, তাঁহার মত অভাগীর গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়াই সে হতভাগ্য সন্তান আপনার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সেই দিন মহিষীর কষ্ট ক্রোধে পরিণত হইল, সেই দিন তিনি আর সকল ভুলিয়া সন্তানের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু কথায় কথায় যখন আবার পুত্রের জন্মঘটনাটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি এমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার নয়নের ক্রোধজ্যোতি অশ্রুজলে মলিন হইয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার সে ভাব রহিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া মহিষী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"তুমি যদি সত্য বলিতে না ডরাও, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য-কবচ কনিষ্ঠকে পরাইবার প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া লোককে অন্যরূপ বুঝিতে দিলে কেন?"

রাজা সরোষে বলিলেন—"আমি কখন কি ভাবিয়া কি কাজ করি—তাহা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ান আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তবে লোকে যদি মনের কথা আঁচিতে গিয়া এক বুঝিতে আর বুঝিয়া লয়—সে জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। লোকভয়ে সেদিন যদি সত্য কথা লুকাইতাম তাহা হইলে আজও লোকভয়ে জয়সিংহকে রাজত্ব দিতে কুণ্ঠিত হইতাম। তখন যদি

কোন রকমে লোকে ভুল বুঝিয়া থাকে, এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার রাজ্য আমি যাহাকে ইচ্ছা দিব—সে জন্য আমি লোকের ভয় করি না, লোকের তাহাতে কথা কহিবার অধিকারও নাই।"

মহিষীর আর সহ্য হইল না, শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"না মহারাজ, তাহা মনে করিও না, রাজ্য তোমার বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা দিবার ক্ষমতা তোমার নাই, তুমি বিচারক বলিয়া অবিচার করিতে তোমার ক্ষমতা নাই, রাজা বলিয়া তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিতে পার না; রাজা হইয়া যে নিয়ম ভঙ্গ করে, যে অবিচার করে, সে রাজা নহে, সে স্বেচ্ছাচারী, সে অধর্ম্মাচারী। তাহার দান আর যে গ্রহণ করে করুক, আমার পুত্র তাহা গ্রহণ করিবে না। নিজবলে যখন সে আপনার প্রাপ্যরাজ্য অধিকার করিবে, তখনই এ রাজ্য তাহার। নহিলে তুমি দিতে চাহিলেও এখন তোমার হাত হইতে এ রাজ্য সে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু মহারাজ, তোমার এই অন্যায়াচরণের ফলে যখন শত সহস্র নির্দ্দোষী প্রজার রক্তে প্লাবিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবে, যখন ভ্রাতৃরক্তের কলঙ্কে মিবারের ভবিষ্যদ্বংশ চির দিনের জন্য কালীমাখা হইয়া পড়িবে, তখন অন্যকে দোষী করিও না, তখন মনে থাকে যেন—তাহা তোমারি কার্য্যের ফল, তোমারি পাপের ফল। মহারাজ, যে সূর্য্য বংশের রাজা দশরথ সত্যের জন্য স্বামের

জন্য প্রাণসম পুত্র রামকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই সূর্য্য বংশে না তোমার জন্ম? আজ তুমি সে বংশের নাম ডুবাইলে—কিন্তু যত দিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য আছে, তত দিন অন্যায় দিয়া ন্যায়কে ডুবাইতে পারিবে না, সত্যের জয়ে বাধা দিতে তোমার ক্ষমতা নাই?"

সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে কথাগুলি বলিয়া ধীর পদক্ষেপে গর্ব্বিতা রমণী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রিতে আর তিনি ভীমসিংহের সহিত দেখা করিলেন না, ভাবিলেন পরদিন তাঁহাকে সকল বলিবেন।

(২)

মহিষী চলিয়া গেলেন, তাঁহার তিরস্কার বজ্রের স্বরে রাণার মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত বাজিতে লাগিল—ক্রমাগতই তিনি শুনিতে লাগিলেন, "যে বংশে দশরথ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য প্রাণসম পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই বংশে না তোমার জন্ম!" রাণার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মহারাজাধিরাজ রাণা রাজসিংহ আজ ক্ষুদ্র শিশুর মত অধীর হইয়া বলিলেন, "ছি ছি, কি করিয়াছি। সত্যের বংশে জন্মিয়া স্নেহের পদতলে ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়াছি! ভগবন্! এই অকলঙ্ক সূর্য্যবংশে কালী দিবার জন্যই কি এই কুলাঙ্গারকে এ বংশে প্রেরণ করিয়াছিলে!"

মহারাজের অন্ধ নয়ন আজ হঠাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এতদিন তিনি একথা এরূপ করিয়া কখনও ভাবেন নাই। তিনি ভাবিতেন যখন ভীমসিংহ জয়সিংহ উভয়ে এক দিনেই জন্মিয়াছে, তখন বড় ছোট হিসাবে কাহারও রাজ্যে অধিকার জন্মে নাই, তাঁহার রাজ্য তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। স্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি যে ইহার আর এক দিক একেবারেই দেখিতেছেন না, এ কথা তাঁহার মনেই আসে নাই, আজ অতি ভীষণরূপে সে ভ্রম সে মোহ ঘুচিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি রাজসিংহের নিদ্রা হইল না, প্রভাত হইবামাত্র প্রহরীকে বলিলেন—"যুবরাজ ভীম-সিংহকে এখানে আসিতে বল।"

"যুবরাজ ভীমসিংহ!" প্রহরী আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহারা জয়সিংহকেই যুবরাজ বলিয়া জানে। সে 'যো হুকুম মহারাজ' বলিয়া বাহিরে আসিয়া একবার আশ্চর্য্য-ব্যঞ্জক 'হুম' করিয়া লইল, তার পর গুম্ফ জোড়ায় মহা প্রতাপে 'তা' দিতে দিতে ভীমসিংহের নিকট গমন করিল।

পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া ভীমসিংহেরও আশ্চর্য্য বোধ হইল, তাঁহার কাছে ইহা বড় নূতন। পিতা তাঁহাকে আর ন দিন ডাকিয়াছেন বলিয়া কই মনে পড়ে না। ভীমসিংহ লেন, "এ আবার কি? জয়সিংহকে রাজা করিয়া কে তাহার ভৃত্য করিবার প্রস্তাব হইবে নাকি? এ হস্তে অসি ধরিবার ক্ষমতা যত দিন থাকিবে তত-

দিন যে জয়সিংহ সিংহাসনে বসিবে না, তাহা বুঝি এখনও তিনি জানেন না।” পিতার পক্ষপাতিতা স্মরণ করিয়া ভীমসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; একবার ভাবিলেন—যাইব না; আবার ভাবিলেন, ‘না পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না—তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আজ মুক্তকণ্ঠে মনের কথা প্রকাশ করিব।’—ভীমসিংহ একরাশি ক্রোধ লইয়া পিতার নিকট আগমন করিলেন—কিন্তু যখন রাণার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, রাজমুখে অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা দেখিতে পাইলেন, পিতার চিন্তাকুল নয়নের স্নেহদৃষ্টি তাঁহার প্রতি স্থাপিত দেখিলেন,—তখন ভীমসিংহ সে ক্রোধ কোথায় ফেলিয়া দিবেন যেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা তখন তাঁহার মনে নিমেষে লয় পাইয়া গেল, সমস্ত হৃদয়ে কেবল একটি কষ্টের ভাব দুঃখের ভাব বই তখন আর কিছুই রহিল না। ভীমসিংহের সেই ক্রোধহীন, প্রশান্ত, সম্মানপূর্ণ ভাব দেখিয়া রাজা অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি এতক্ষণ যে ভীমসিংহকে দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন, সে ভীমসিংহকে না দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার অন্যায়ের বিচারক, বদ্ধভ্রুকুটি, ক্রুদ্ধমুখ, ভীমসিংহের পরিবর্ত্তে তাঁহার আপনার স্নেহময় বালক সন্তানকে পূর্ণ সম্মান ভরে অভিবাদন করিতে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। পুত্রের সে সম্মান সে প্রশান্ততা সে ভক্তির ভাব রাণার হৃদয়ে যেরূপ অনুতাপের অনল

জ্বালিয়া দিল—ভীমসিংহের সহস্র ভ্রূকুটি, সহস্র ক্রোধও তাহা পারিত না। লজ্জায় অনুতাপে রাজা আর তাহার দিকে চাহিতে পারিলেন না, মুখ নত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বৎস ভীমসিংহ!" সেই স্নেহের স্বরে ভীমসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। মহারাজ ত কখনো তাঁহাকে এরূপ আদর করিয়া ডাকেন নাই! এ পর্য্যন্ত তিনি পিতার কাছে অনাদরই পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মনে আছে, বাল্যকালে এক দিন দুই ভ্রাতায় উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, রাণা সেই উদ্যান দিয়া যাইবার সময় জয়সিংহকে আদর করিয়া গেলেন—কিন্তু তাঁহার সহিত একটি কথাও কহিলেন না, অভিমানী বালক সেখান হইতে চলিয়া গিয়া মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কত না কাঁদিয়াছিল—কিন্তু কাঁদিবার কারণ মাকেও সে বলে নাই। তাহার পর বড় হইয়া পদে পদে পিতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া আসিয়াছে; অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও রাণা জয়সিংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া পুরাইয়া দিয়াছেন। ভীমসিংহের জন্য তাঁহার পিতার হৃদয়ে যে একবিন্দু স্নেহের স্থান আছে, তাহা ভীমসিংহ এ পর্য্যন্ত মনেই করেন নাই—হঠাৎ এতদিনের পর আজ যখন পিতা স্নেহভরে ডাকিলেন—"বৎস ভীমসিংহ!" তখন তাঁহার হৃদয় তোলপাড় হইয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে ভীমসিংহ উত্তর করিলেন—"পিতঃ"! এতদিন তিনি 'মহারাজ' বলিয়াই সম্বোধন করিয়া

আসিয়াছেন। মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বৎস আমি তোমার উপর অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর"।

ভীমসিংহের বীর নেত্র দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িল, এ অশ্রু সন্তানের অভিমানাশ্রু। পিতা তাঁহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছেন, এতদিন পরে যে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, এতদিন পরে যে তিনি তাহাকে পুত্রের স্নেহ দিলেন—সেই আহ্লাদে ভীমসিংহের অভিমান আর চাপা রহিল না। এরূপ ভাব আগে কখন তিনি অনুভব করেন নাই। উথলিত চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন—"পিতঃ তোমার স্নেহে সন্দেহ করিয়া এতদিন দূরে দূরে যদি না থাকিতাম, তাহা হইলে কি তোমার স্নেহ হারাই? সে জন্য আমিই তোমার কাছে দোষী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর"। ভীমসিংহকে নীরব দেখিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বৎস তুমি ক্ষমা করিতে না পার—কিন্তু আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমার অন্তরদেবতার নিকট, আমার ঈশ্বরের নিকট দোষমুক্ত হইব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ন্যায্য অধিকার আমি তোমাকেই দান করিব, রাজ মুকুট তোমারই মস্তকে বৎস শোভিত হইবে। কিন্তু আমি দিলেও সম্মুখে একটি প্রতিবন্ধক। যাহা জয়সিংহের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, আমারই দোষে সে তাহা পাইবার আশা করিতেছে, এখন হঠাৎ নিরাশ হইয়া সে অন্নে ছাড়িবে

না—রাজ্য লোভে দেশ অরাজক করিয়া তুলিবে—ইহার প্রতিকার এক ভিন্ন অন্য নাই।”—বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি কোষমুক্ত করিয়া উঠাইয়া ধরিলেন। প্রভাত রশ্মি তাহার উপর চক্ চক্ করিয়া উঠিল, তিনি তাহা ভীমসিংহের হাতের কাছে ধরিয়া বলিলেন—“লও বৎস—এই অসি তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া এস। এক জনের রক্তে শত শত প্রাণীর রক্তপাত নিবৃত্তি হউক, অন্যায়ের পতনে নির্ব্বিবাদে ন্যায়ের জয় হউক। বৎস শিহরিয়া উঠিও না, কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পত্নী পুত্র স্নেহ মমতা কাহারও স্থান নাই”—?

রাজসিংহের স্বর কাঁপিয়া আসিল, এ সত্যের ভীষণতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আজ অনুভব করিতেছিলেন। ভীমসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজের মনের দারুণ আস্থা ছবির মতন তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল, কর্ত্তব্যের জন্য তিনি যে আপনার অধিক স্নেহের ধনকে বিসর্জ্জন দিতেছেন—তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, পিতার সে উদারতা, সে মহত্ব পুত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার পিতৃভক্তি সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল; ভীমসিংহ বুঝিলেন, রাণা যে অসি জয়সিংহের বুকে বিঁধাইতে দিতেছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিজের বুকেই বিঁধাইতে দিতেছেন। মুখে আর ভীমসিংহের কোন কথা ফুটিল না, মনে মনে বলিলেন—“পিতা তুমি দেবতা।”

রাজসিংহ পুত্রকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন—"বৎস শিহরিয়া উঠিও না, এ হত্যায় পাপ নাই, ন্যায়সিদ্ধির জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য তুমি এ কাজ করিতেছ—যদি ইহাতেও পাপ হয়, সে পাপ তোমার নহে, সে পাপ আমার। আমার আদেশে তাহা তুমি সম্পন্ন কর"। ভীমসিংহের কথা ফুটিল—ভীমসিংহ পিতার হস্ত হইতে অসি লইয়া তাঁহার চরণতলে রাখিয়া বলিলেন,—

"পিতঃ অসি ফিরাইয়া লউন—ইহাতে আমার আবশ্যক নাই। আপনি আমার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, আপনার কর্ত্তব্য আপনি পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়াছেন—এখন আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিব। আমা হইতে যাহাতে রাজ্যের এক বিন্দু শোণিতপাত না হয়, যাহাতে কণা মাত্র পাপ-চিন্তাও জয়সিংহকে স্পর্শ না করে, তাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিব। আপনি আজ আমাকে যে অধিকার দান করিলেন—আমার সেই অধিকার আমি আজ জয়সিংহকে দান করিলাম। আজ হইতে রাজ্য ন্যায্যরূপে তাহারই হইল। এখানে থাকিলে কি জানি যদি মোহবশতঃ কখন রাজ্যে লোভ আসিয়া পড়ে—আমি মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আজ আপনি যে স্নেহ দিয়াছেন, যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই দুর্লভ সম্পত্তি হৃদয়ে লইয়া আমি

আজই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব,—ইহার যদি অন্যথা হয় ত আমি আপনার সন্তান নহি”।

রাণাকে কথা কহিবার—বাধা দিবার সময় না দিয়া ভীমসিংহ পিতৃচরণ স্পর্শ করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন,—মহারাজ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই দিনই ভীমসিংহ স্বহস্তে জয়সিংহকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া আপনার প্রিয় সৈন্যসামন্ত দলবল লইয়া সেই যে দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন আর ফিরিয়া আসিলেন না। অনেক দিন পরে তাঁহার সঙ্গীরা অনেকে মিবারে ফিরিয়া আসিল কিন্তু তাঁহাকে লইয়া নহে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া।

ক্ষত্রিয় রমণী

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

(১)

"ঐ বরাহ" "ছুটাও ছুটাও" "আরো ছুটাও" "ঐ দিকে চল" এই দিকে এস।"

মৃগয়াকারীদের শতকণ্ঠের এইরূপ চীৎকার ধ্বনি আরাবল্লিস্থ অন্ধয়া-নামক বনের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল, অশ্বারোহীগণের দ্রুতপদ-নিক্ষেপে অন্ধয়ার পার্ব্বত্যভূমি বিদারিত হইয়া উঠিল, বরাহ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে, পর্ব্বতের এ ধার হইতে ওধারে—বনের এদিক হইতে ওদিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে বন ছাড়াইয়া ঢালুপথ দিয়া এক সুবিস্তীর্ণ ভুট্টা-ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মিবারের যুবরাজ অরিসিংহ সদলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ক্ষেত্র-সম্মুখে উপনীত হইয়া রুদ্ধগতি হইয়া দাঁড়াইলেন—অশ্ব চালাইবার আর স্থান দেখিলেন না।

রণোন্মত্ত হস্তী হঠাৎ আহত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, শীকারোত্তেজিত যুবরাজ শীকারের অনুসরণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধগ্রীব সফেন-মুখ অশ্বের রাশ শিথিল করিতে ভুলিয়া মুহূর্ত্ত কাল সেইরূপ স্তম্ভিত চিত্রার্পিতের মত অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। এই সময় একটী গ্রাম্য কন্যা আসিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল। যুবতী সেই ক্ষেত্রের অধিপতিরই কন্যা, ক্ষেত্রের নিকটস্থ উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষেত্র পাহারা দিতে দিতে সে শূকরকে ক্ষেত্রমধ্যে লুকাইতে দেখিল, এবং মৃগয়াকারী-গণের দুর্দ্দশা অনুভব করিয়া তাঁহাদের সাহায্যের মানসে দ্রুতপদে যুবরাজের নিকট আগমন করিল। যুবরাজ তখন আস্তে আস্তে অশ্বের রাশ শিথিল করিতে করিতে যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কি সুন্দর, বলিষ্ঠ সুগঠন উন্নত দেহ! কি সরল সুন্দর মুখশ্রী! তাহার আঁটসাট সাদাসিদে গ্রাম্যবেশে সেই সুগঠন দেহের সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর ফুটিয়াছে, তাহার অযত্ন-রক্ষিত এলোথেলো কেশে সাজসজ্জাহীন মুখখানি যেন আরো সুন্দর দেখাইতেছে, সেই বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ, অসজ্জিত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কাছে মণিমাণিক্য-বিভূষিত, যত্ন-সজ্জিত, যত্নরক্ষিত, সৌন্দর্য্যও যেন মলিন হইয়া পড়ে। যুবরাজ দেখিলেন, তাহার মাথায় সিন্দুর নাই, হাতে কঙ্কণ আছে অথচ লোহ নাই, যুবতী অবিবাহিতা। তিনি

বলিলেন, "সুন্দরি—এই ভুট্টাবনের মধ্যে অশ্ব যাইবার কোন পথ আছে কি?"

যুবতী বলিল, "না, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শূকর তাড়াইয়া আনিতেছি।" বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, একটি দীর্ঘ ভুট্টাগাছ বিনা আয়াসে, সমূলে উৎপাটিত করিয়া হস্তে তুলিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে ভুট্টাবনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। মৃগয়াকারীগণ উৎসুক নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতী শূকর তাড়াইয়া তাহাকে পার্শ্বের উচ্চ ভূমিতে আনিয়া ফেলিল—মৃগয়াকারীগণ সেইদিকে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। বরাহ প্রাণভয়ে কাতর হইয়া আবার ভুট্টাবনের মধ্যে পলায়ন চেষ্টা করিল,—অন্য যে দিকে চায় সেই দিকেই দ্রুতধাবিত অস্ত্রধারী মনুষ্য; কেবল ভুট্টাবনের দিকে একাকী সেই যুবতী মাত্র; শূকর দেখিল, যদি ইহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারে তবেই তাহার প্রাণ বাঁচে। সে মৃত্যুবলে বলী হইয়া রমণীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দূর হইতে সকলেই রমণীর এই বিপদ দেখিতে পাইলেন—সকলেই ত্রস্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন, কিন্তু বরাহ তীরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এই যুবতীর গাত্রের উপর আসিয়া পড়ে পড়ে, এই রমণী গেল গেল—বুঝি আর কেহ তাহাকে

রক্ষা করিতে পারে না! যুবরাজের অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল,—কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিবার আগেই শূকর রমণীকে তাড়া করিয়া ঠিক তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়িল—যুবতী নির্ভয়চিত্তে সেই আক্রমণোদ্যত শূকরের মস্তকে এমন বলে ভুট্টাদণ্ডের আঘাত করিল যে, তাহাতে যেন বজ্রাহত নির্জীব হইয়া সে দাঁড়াইয়া গেল,—সেই সময় যুবরাজের অশ্বও নিকটে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর কোন ভয় ছিল না। রমণী হাসিতে হাসিতে শূকরের কাণ ধরিয়া তাঁহার নিকট টানিয়া আনিল, যুবরাজ তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিলেন; আর সকলে অবাক হইয়া রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল। রাজপুতানার রমণীগণের সাহসের অভাব নাই—তথাপি এই গ্রাম্য নারীর সাহস দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল!

(২)

প্রথম কুমার। "ছি ছি এ বড়ই লজ্জার কথা!

দ্বিতীয়। "তাইত, আমরা থাকিতে একজন স্ত্রীলোক—"

যুবরাজ। "কেন লজ্জার কথা কি? আমাদের দেশে এমন স্ত্রীলোক আছে সে ত গৌরবেরই কথা।"

প্রথম কুমার। "দেশের গৌরব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের গৌরব আর রহিল কই? স্ত্রীলোকের কাছে শেষে হারিলাম!"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "যদি হারিতেই হয়—ত

রমণীর নিকট—বিশেষতঃ অমন রমণীর নিকট হারিতে আমার ত দুঃখ নাই—।”

তৃতীয় কুমার হাসিয়া বলিলেন—“যুবরাজ শীকার করিতে আসিয়া আপনি নিজেই শেষে শীকার বনিয়া গেছেন দেখিতেছি !”

অদূরে একটা বাঘের ছালের উপর বিশ্বম্ভর ভুড়ি-দারজি (শেষের নামটি কুমারদের দেওয়া) শুইয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সম্পর্কে রাজবাড়ীর সকলেরই সাধারণ শ্যালক। কুমার অজয়সিংহের গুরুপুত্র-পত্নীর মামাত-ভাইএর পিসতত বোনের ননদের ইনি পাতান ভাই, সুতরাং গুরুপুত্রের ইহাঁর সহিত যে ঘনিষ্ট ও গুরুতর সম্বন্ধ, সেটি রাজবাড়ীর সকলেই নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। ইহাঁরও তাহাতে বড় একটা আপত্তি নাই, কেননা সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়া সারা সময়টা ইনি দিব্য পায়ের উপর পা রাখিয়া, গদির উপর অঙ্গ ঢালিয়া, আলসেমি করিয়া, ঘুমাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনযাপন করেন, আর মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই রাজকুমারদিগের উপরেও বিলক্ষণ করিয়া এক হাত ঝাড়িয়া লইতেও ত্রুটি করেন না। তৃতীয় কুমারের কথা বিশ্বম্ভরের কাণ এড়াইল না, তিনি ঠিক সময়টিতে উঠিয়া বসিলেন, বোধ করি ইনি ঘুমটাকে অনেকটা নেপোলিয়ানি ধরণে তৈয়ার করিয়া

লইয়াছিলেন, দরকারের সময়টিতে ঠিক ঘুমটি ভাঙ্গিয়া যাইত, নহিলে অন্য সময় সহস্র ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গায় কার সাধ্য। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়াই বলিলেন—"সেকি কথা কুমারজি? আমিত জানি যেটা শীকার বলিয়াছে—সেটা নিতান্তই শূয়ার—।" সকলেই হাহা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, তিনি আবার হাই তুলিতে তুলিতে শুইবার উদ্যোগ করিলেন,— এমন সময়ে হঠাৎ হাসির উচ্ছ্বাসটা থামিয়া গেল। নিকটের একটী বৃক্ষে যুবরাজের অশ্ব বাঁধা ছিল, হঠাৎ পশ্চিম হইতে একটী ঢিল সবলে তাহার দিকে পড়িতে দেখা গেল,—আর অমনি অশ্ব লাফাইয়া উঠিয়া করুণ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। কুমারগণ বুঝিলেন, অশ্ব আঘাত পাইয়াছে। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি অশ্বের নিকটে আসিয়া দেখিলেন—যে, একটা সামান্য ঢিলের আঘাতে অশ্বের উরুদেশের হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এত জোরে কে ঢিল ছুঁড়িল! ইহা ত সামান্য জোরের কাজ নহে? তাঁহাদের ক্রোধ কৌতূহলে পরিণত হইল। এই সময় সেই যুবতী নিকটে আসিয়া বলিল, "আমাকে মার্জ্জনা করুন্—আমি পাখীর দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িতেছিলাম—দৈবক্রমে অশ্বের পায়ে আসিয়া লাগিয়াছে, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছি।"

ভুঁড়িদারজি বাঘের ছালের উপর হইতেই তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"সুন্দরি, দুঃখ করিবেন না, ঢিলটা যে ঘোঁড়ার উপর দিয়াই গিয়াছে তাহা আহ্লাদেরই কথা।" যুবতী একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহির করিয়া অশ্বের উরুদেশে লেপন করিতে লাগিল, লেপন শেষ হইলে বস্ত্র দিয়া সেই স্থান বন্ধন করিল, বন্ধনান্তে কুমারদিগকে ঔষধকৌটা প্রদান করিয়া—ঔষধ ব্যবহারের নিয়মাদি বলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজপুত্রদিগের ক্রোধের ভাব প্রশংসার ভাবে পূর্ণ হইল। রমণী অশ্বকে আহত করিয়া অশ্বপ্রভুদের ধন্যবাদ লাভ করিল। যুবতী চলিয়া গেলে কুমারদিগের যেন মুগ্ধভাব দূর হইল, তাঁহাদের কথা ফুটিল। একজন বলিলেন "আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঐ কোমল বাহুতে যেন শতঘ্নির বল!"

শ্যালকজি বলিলেন—"শতঘ্নি হইলে ত রক্ষা ছিল, একেবারেই কাজ নিকাশ হইয়া যাইত, ও হাতের গোলা-গুলি যাহার উপর আসিয়া পড়ে সে ত একেবারে মরে না—আধমরা হইয়া থাকে।" কথাটা সকলের লাগিল ভাল, যুবরাজের দিকে চাহিয়া সকলেই হাসিতে আরম্ভ করিল, যুবরাজও হাসিয়া বলিলেন—"মরিতে বাকী ছিল বটে, কিন্তু তোমাদের কথার অস্ত্র না থামিলে তাহাও বুঝি আর বাকী থাকেনা।"

একজন পারিষদ বলিলেন—"যুবরাজ কোন হইল না, শীকার করিতে আসিয়া কষ্টমাত্র সার, এখন যদি কথা বন্ধ করিতে হয় ত বাঁচি কি করিয়া" ?

কথাটা নিতান্ত সত্য, যেখানে কর্ম্মের যত অভাব সেইখানেই কথার তত ছড়াছড়ি! যুবরাজ বলিলেন—"কর্ম্মের জন্য এত কাতর হইয়া থাক, আমি কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতেছি। চল সকলে মিলিয়া একবার গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসি, যুবতীর পরিচয়টাও অমনি জানিয়া আসা যাইবে, একটা অসাধারণ রমণী!—বাড়ী গিয়া ত তার সম্বন্ধে গল্প করা চাই।" প্রস্তাবটা সকলেরই মনের মত হইল। প্রথম কুমার বলিলেন—"এই মাত্র আমি আপনার নিকট ঠিক এই প্রস্তাবই করিতে যাইতেছিলাম"।

দ্বিতীয় কুমার বলিলেন—"তুমি ত এই মাত্র বলিতে যাইতেছিলে—আমি যে সকাল হইতেই এইরূপ প্রস্তাব করিব ভাবিতেছি।"

তৃতীয় বলিল—"তুমি ত কেবল ভাবিয়াছ—আমি যে মহারাজকে এই কথাই তখন বলিতেছিলাম।"

চতুর্থ বলিল—"ইঃ তুমি বলিয়াছিলে! যুবরাজকে জিজ্ঞাসা কর দেখি আমি আগে বলিয়াছিলাম কি না।" পারিষদগণ টেপাটেপি করিয়া বলিল—উহাঁরা বড় লোক কিন্তু ছোটর ধন লইয়া;—অথচ সেই কথাটা প্রকাশ

করিলেই মহাকাণ্ড! তা মুখেই যেন নাই বলিলাম, মনে মনে ত চুপ করিতে পারি না।"

শ্যালকজি দেখিলেন বড় গোলযোগ, বলিলেন—"আমি মীমাংসা করিয়া দিতেছি,—যুবরাজ ছাড়া আর সকলেই এ প্রস্তাব আগে করিয়াছেন।"

মুখে সকলেই হাসিল, কিন্তু সকলেই মনে মনে কথাটা নিজের পক্ষে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিল, আর কে জানে ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিয়াছিল কি না—যে দিন যুবরাজ ব্যতীত অন্য মৃগয়াকারীগণ সকলেই উক্ত প্রস্তাব-কারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ জগতের এইরূপ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩)

রাজপুত্রগণ অশ্বারোহণে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য পথ, পথের এক পার্শ্বে পাহাড়ের গাত্রে বড় বড় গাছ জঙ্গল বাঁধিয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, আর এক পার্শ্বে দূরে অতি দূরে আকাশের গাত্রে পাহাড়-শ্রেণী সুনীল মেঘের মত মাথা তুলিয়া আছে। অপরাহ্ন-কাল, সূর্য্য অশ্বারোহীগণের পশ্চাৎদিগের একটা পাহাড়-শৃঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আলোক দিতেছে, আর তাহাদের সম্মুখে অনন্ত নীল আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, সূর্য্যের

আলোকে চাঁদের আলো মিশিয়া চারিদিক ঈষৎ-স্বর্ণময় স্নিগ্ধ রজতাভায় রঞ্জিত করিয়া নিকটের রজত কণায় উচ্ছ্বসিত ঝরণার বুকে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আকাশের পূর্ব্ব কোণে দুই একটী তারকা মৃদু মৃদু জ্বলিয়া সেই ঝরণার উজ্জ্বল বারিকণার প্রতি ঈর্ষা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! ধীরে ধীরে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়া পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া গাছে গাছে বাঁশির তান তুলিয়া জোরে জোরে ফিরিয়া যাইতেছে। অশ্বারোহীগণ প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ শোভা উপভোগ করিতে করিতে পথের একটী বাঁক ছাড়াইয়া গ্রামের রাস্তায় পদার্পণ করিলেন, অমনি সে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল—যে শৃঙ্গের আড়ালে সূর্য্য লুকাইয়া পড়িয়াছিল—সে শৃঙ্গ দূরে পড়িয়া গেল—মুক্ত সূর্য্যের রশ্মিতে চারিদিক হঠাৎ লালেলাল হইয়া উঠিল। চন্দ্র তারা দৃশ্যের অপর পার্শ্বে লুকাইয়া পড়িল।

একই সময় ঘূর্ণায়মান পথের এক পার্শ্বে সূর্য্যালোক, এক পার্শ্বে চন্দ্রালোক, এক পার্শ্বে দিবা, এক পার্শ্বে দিবাময় সন্ধ্যা—চন্দ্রসূর্য্যবিকাশের এই রহস্যময় বৈকালিক শোভা কেবল পার্ব্বত্য প্রদেশেরই কোন কোন স্থানে দেখা যায়। অশ্বারোহীগণের নিকট যদিও এ দৃশ্য নূতন নহে, তথাপি এই সুবর্ণখচিত দৃশ্যে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই লোহিত সমুদ্রে অবগাহিত হইয়া তাঁহাদের মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে একটি উন্নতবপু যুবতীমূর্ত্তি আবির্ভূত

হইল। যুবতীর মস্তকে দুগ্ধ কলস, দুই পার্শ্বে দুইটি মহিষ, সেই মহিষ দুইটির পৃষ্ঠে দুই হাত রাখিয়া যুবতী তাহাদের চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। কুমারগণ যুবতীকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহারা আপনাদের মধ্যে আস্তে আস্তে কি বলাবলি করিলেন, কি একটা পরামর্শ হইল, সকলেই হাসিয়া কুটি কুটি হইতে লাগিলেন, যুবরাজ হাসিটা চাপিয়া যুবতীর দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন—,সকলে দাঁড়াইয়া কি একটা যেন রহস্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যুবরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া হঠাৎ যেন' অসতর্ক অবস্থায় একেবারে যুবতীর উপর আসিয়া পড়' পড়' হইলেন, আর যেন তাঁহার অশ্ব সম্বরণের ক্ষমতা নাই,—তিনি ভয়ার্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি সর সর—পথ দাও—" অভিপ্রায় যুবতী ভয়-বিহ্বল হইয়া পলায়নোদ্যত হইবে, অমনি তাহার দুগ্ধকলস মাথা হইতে পড়িয়া যাইবে, আর তাঁহারা সকলে হাসিয়া উঠিবেন, যুবতী অপ্রতিভ হইবে।

"সর সর" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে যুবরাজ—মহিষ ও যুবতীর মধ্যে আসিয়া পড়িবার মানসে অশ্ব একটু' বাঁকাইয়া লইলেন। অদূরে অশ্বারোহীগণের হাসি মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইল, তাহাদের মনে হইতে লাগিল—রহস্য বুঝি সত্যই প্রাণঘাতক হইয়া পড়ে! নিস্তব্ধে তাহারা শেষ দেখিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল। যুবতী যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিল—বুঝিল তিনি তাহার

গাত্রের ঠিক পাশ দিয়া তাহাকে নড়াইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া—একটুও সরিতে চেষ্টা না করিয়া, পার্শ্বস্থ মহিষের শৃঙ্গটা হাতে ধরিয়া যুবরাজের দ্রুতশীল অশ্বের গাত্রে লাগাইয়া দিল—অশ্ব হঠাৎ চমকিয়া লাফাইয়া হটিয়া গেল, যুবরাজ অসতর্ক অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তিনি যে রহস্য জমাইতে চাহিয়াছিলেন—তাহা জমিল বটে—তবে সম্পূর্ণ উল্টা রকমে জমিল। যুবরাজ পড়িবামাত্র যুবতী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, অশ্বারোহীগণও নিকটে আসিয়া পড়িল। কিন্তু কাহারও সাহায্য আবশ্যক হইল না, তিনি অপ্রস্তুত হইয়া আপনিই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতী বলিল, "মাপ করুন, আমার ইচ্ছায় এরূপ হয় নাই।" যুবরাজ লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলেন না। সে তখন আস্তে আস্তে এমন প্রশান্ত ভাবে চলিয়া গেল—যেন কিছুই হয় নাই। রমণী চলিয়া গেলে যুবরাজ প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার দেহের কোনস্থলে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে কি না; দেখিলেন, সৌভাগ্যক্রমে কোথাও লাগে নাই। তখন আপনারা সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া আর একবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন। হাসিটা ফুরাইলে একজন বলিল "যুবরাজ, এ কি হইতেছে? সমস্ত দিন আমরাই যে হটিতেছি!"

যুবরাজ বলিলেন—"একেই আর কি বলে গ্রহ।"

আর এক জন বলিল—"গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া এখন গ্রহের শেষটা কি একবার দেখা যাউক।"

যুবরাজ বলিলেন—"কোন্ লজ্জায় আর গ্রামে যাই, একটা ঘোড়াকে সামলাইতে পারিলাম না,—মুখ দেখাই কি করিয়া?"

আর একজন বলিল—"ঘোড়াটা ত সামলাইতে পারিলেন না, এখন প্রাণটা সামলাইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলেই যে হয়।"

সত্য সত্যই আর তখন গ্রামে যাওয়া হইল না। তাঁহারা একটা নিঝরিণীর ধারে গাছের তলায় বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলেন। কিছু পরে একজন গ্রামবাসীকে নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও সন্ধানটা জানিয়া আসি।" গমনশীল গ্রামবাসীর কাছে আসিয়া বিশ্বম্ভর পশ্চাৎদিক হইতেই বলিল—"বাপুহে তোমার নাম কি?" গ্রামবাসী সেই দিকে মুখ ফিরাইবামাত্র নিতান্ত অপরিচিত মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল—সে একটু উদ্ধত ভাবে বলিল, "সে খবরে তোমার কাজ কিহে বাপু?"

ব্রাহ্মণ মহা ক্ষাপ্পা হইয়া বলিয়া উঠিল—"নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি কত সৌভাগ্য—তা না বেটার রকম দেখ না"। গ্রামবাসী হস্তস্থিত লাঠির উপর দুই হাত রাখিয়া ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। শ্যালকজি বলিল—"হঃ তবেত মরিয়া

গেলাম—আমি কি আর রাগ করিতে জানি না নাকি? গ্রামবাসী বলিল—"কে তুই উন্মাদ, চলিয়া যা, ফের যদি কথা কহিবি মুখ ভাঙ্গিয়া দিব?" বিশ্বম্ভর কুমারদের প্রিয়পাত্র, তাহার বুকের পাটা এক জন সামান্য গ্রাম্যের কথায় দমিবার নহে। সে বলিল—"চলিয়া যাইব! ওঁর কথায় চলিয়া যাইব! জানিস বেটা আমি কে? মুখ সামলাইয়া কথা কহিস।"—গ্রামবাসী ভূমিতে পাদাঘাত করিয়া বলিল, —"তুমি যার সঙ্গে কথা কহিতেছ সে কে জান—এক জন ক্ষত্রিয়।"

বিশ্বম্ভর। "ক্ষত্রিয়! তোর মত কত ক্ষত্রিয় দেখিয়াছি, কি বলিব কলিকাল, নহিলে আজ ব্রহ্মণ্যতেজে তোকে এইখানে ছাই করিয়া রাখিয়া যাইতাম।" ক্ষত্রিয় আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ দাঁত দেখাইয়া বলিল —"আবার হাসি! চল বেটা যুবরাজের কাছে—।" এই সময় আর দুইজন পারিষদ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বৃক্ষতল হইতে উভয়ের উচ্চ স্বর শুনিয়া বুঝিয়াছিল ঠাকুর গোলযোগ বাধাইয়াছেন, নিকটে আসিয়া বলিল,— "মহাশয় ও ব্রাহ্মণের কথা ধরিবেন না উহাকে পাগল বলিয়া জানিবেন—"

ক্ষত্রিয় বলিল—"হাঁ৷ পাগলই দেখিতেছি—।"

বিশ্বম্ভর রাগ করিয়া চলিয়া গেল, একজন পারিষদ বলিল —"মহাশয় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—অনুগ্রহ

করিয়া বলিলে বড়ই বাধিত হই। আজ সকালে একটি কন্যা অশ্বয়া বনের নিকটের একটি ভুট্টাক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন—তাঁর নিবাস কোথা? তিনি কে বলিতে পারেন?"

ক্ষত্রিয়। "তিনি আমার কন্যা। এই গ্রামেই আমরা থাকি।" বিশ্বম্ভর যাইবার সময় এই কথা শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া যুবরাজকে এই সংবাদ প্রদান করিল, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাৎ কামনায় একজন কুমারকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন—মহাশয় মিবারের যুবরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন—যদি অনুগ্রহ করিয়া—" কথা শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় গর্ব্বিত স্বরে বলিল "মহাশয় মাপ করিবেন। তিনি মিবারের যুবরাজ আমি এই গ্রামের অধিপতি। এখানে কেহ আসিলে প্রথমে তিনিই আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন—নহিলে আমরা গ্রামবাসীরা আগন্তুকের ব্যবহারকে অভদ্রতা জ্ঞান করি,—মিবারের যুবরাজ তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। কিন্তু মিবারের যুবরাজ বলিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি আমার কর্ত্তব্য ভঙ্গ করিয়া আপনাকে অবনত করিতে পারি না,—নিয়মের কাছে ছোট বড় নাই।

কুমারগণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ের এত বড় কথা! কিন্তু এ আশ্চর্য্য ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আরও একটা মহা আশ্চর্য্যের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন।

ক্ষত্রিয়ের কথার উত্তরে যুবরাজ স্বয়ং পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন—"মিবারের যুবরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপনার সম্মান প্রদর্শনে যে ত্রুটি দেখাইয়াছেন আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিয়া এখন তাহাব প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত—।"

সকলে যেন কি শুনিল বিশ্বাস্ করিতে পারিল না। সত্যই যুবরাজ একজন সামান্য ক্ষুদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন! কিন্তু এখনও তাহারা বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌছে নাই। যুবরাজের কথায় ক্ষত্রিয় গর্ব্বিত স্বরে বলিল "যুবরাজ এ প্রস্তাবে আমাকে যতদূব সম্মানিত করিলেন —দুঃখের বিষয় আমি ইহাতে আপনাকে ততদূর সম্মানিত জ্ঞান করিতে পারিলাম না।"

ইহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই স্পর্দ্ধিত পদক্ষেপে ক্ষত্রিয় চলিয়া গেল—সকল বিস্ময়ে ক্রোধে অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িল।

* * * *

যেমন দর্প ভরে ক্ষত্রিয় কুমারদিগের সহিত কথা কহিয়া আসিলেন গৃহে আসিয়া তেমনি তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল। মিবারের যুবরাজকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাঁহাকে বিস্তর লাঞ্ছনা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর দোষের ক্ষমা চাহিয়া ও কন্যার বিবাহে সম্মতি

জানাইয়া যুবরাজের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। পরদিনই যুবতীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ শীকার করিতে আসিয়া বধূসহ গৃহে গমন করিলেন। এই মহিষীর গর্ভেই পরে মিবার রাজকুল-গৌরব বীরশ্রেষ্ঠ হামীর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১২ বৎসর বয়সে শত্রু জয় করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি

(১)

সম্রাট সেকন্দর লোদির অমাত্য আসফ খাঁ কোন কার্য্য উপলক্ষে বুন্দিনগরে অবস্থিতি কালে মহারাজ দেব-সিংহের পাথাব নামক মনোহর অশ্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া দিল্লী ফিরিয়া কুক্ষণে সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, "তেমন অশ্ব সম্রাটের অশ্বশালেও নাই। সম্রাট অশ্ববাতুল ব্যক্তি, বহুমূল্য দিয়া বহু দূরদেশ হইতে তিনি অশ্ব আনাইয়া থাকেন, —সুতরাং তাঁহার ভাণ্ডারে সেরূপ অশ্ব নাই, এই কথাটা তাঁহার এতই অসঙ্গত ও অসম্ভব বোধ হইল যে তিনি ইহাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীর কথার প্রমাণ দেখিতে চাহিলেন। সভাসদ মহম্মদ খাঁ দেবসিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বুন্দি প্রেরিত হইল।

অমাত্যগণপরিবেষ্টিত সম্রাট সেকেন্দর লোদি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দাসেরা চামর ব্যজন করিতেছে, স্তাবকেরা স্তুতিবাদ গাহিতেছে, পারিষদবর্গ প্রিয়বাক্যে মনোরঞ্জন করিতেছে, রাজসভাসদ মহম্মদ খাঁ এই সময় আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া সিংহাসনসমীপে দাঁড়াইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মহম্মদ, বুন্দি-রাজের খবর কি ?"

মহম্মদ উত্তর করিলেন "বাদশাহের প্রেরিত উপঢৌকন অনুগ্রহলাভে রাজা আপনাকে সম্মানিত জ্ঞানে আনন্দিত হইয়াছেন এবং আপনার আদেশানুসারে শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইলেন।

অমাত্য আসফ খাঁর প্রতি চাহিয়া সম্রাট বলিলেন "কি আসফখাঁ, বুন্দিরাজের অশ্ব ত এইবার দেখা যাইবে, এখনও কি তোমার সেই কথা ?"

আসফখাঁ মাথা নোয়াইয়া বলিলেন "হুজুর দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমার সেই একই কথা। বুন্দিরাজের অশ্বের ন্যায় অশ্ব আপনার একটিও নাই।

সম্রাট বলিলেন "আমার ঘোড়া 'নবাব'ও তাহার মত নহে ?

আসফ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন 'না'।

সম্রাট আবার বলিলেন "পারস্য-রাজ গত বৎসর যে ঘোড়া আমাকে উপহার দিয়াছেন তাহা দেখিয়াছ ?

আসফখাঁ বলিলেন "দেখিয়াছি, আপনার সব অশ্বই আমি দেখিয়াছি, বুন্দিরাজের অশ্বের কেহই সমকক্ষ নহে।"

সম্রাট বলিলেন "আচ্ছা শীঘ্রই দেখা যাইবে। মনে থাকে তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ হইলে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।

আসফখাঁ বলিলেন "হুজুরের যেরূপ ইচ্ছা।"

(২)

আজ দুই দিন বুন্দিরাজ দেবসিংহ দিল্লী নগরে আসিয়াছেন। সম্রাট তাঁহাকে যথোচিত সমাদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রতিদিন কোন না কোন পারিষদ তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতে আসেন। আজ রাজভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে "অমাত্য আসফখাঁ আপনার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক।"

রাজা বলিলেন—"আসিতে বল।" আসফখাঁ আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা বলিলেন "কি সংবাদ ?"

আসফখাঁ বলিলেন "সম্রাট আপনার আগমনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনি আরামে আছেন কি না তাহা জানিবার জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।"

রাজা বলিলেন "সম্রাটের কৃপায়—আমার কোন কষ্টই নাই, তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা লাভে আমি বিশেষ অনুগৃহীত।"

আসফখাঁ তখন বলিলেন "আপনার অশ্ব পাথারকে দেখিয়া সম্রাট মোহিত হইয়াছেন।"

পাথার বুন্দিরাজের অত্যন্ত প্রিয় ধন, তাহার প্রশংসা শুনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "সেও বাদশাহের অনুগ্রহ।

আসফখাঁ আবার বলিলেন "ঘোড়াটী বাদশাহের অত্যন্ত

পসন্দ হইয়াছে।” ভাবিলেন দেবসিংহ এই ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজেই সম্রাটকে অশ্বটি উপহার দিতে চাহিবেন। কিন্তু আসফখাঁ ভুল বুঝিয়াছিলেন। দেবসিংহ বলিলেন, “জহরীর প্রশংসাতেই জহরের মূল্য।

আসফখাঁ তখন মাথা চুলকাইয়া নত মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন “সম্রাট অশ্বটি কিনিতে চাহেন—কত মূল্য বলিব ?”

বুঁদিরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন “বাদশাহকে বলিবেন আমি পাথারকে বিক্রয় করিব না।”

আসফখাঁ বলিলেন “মহারাজ সম্রাটকে এরূপ উত্তর দেওয়া কি বিবেচনা-সঙ্গত ? ইচ্ছায় না দিলে এ অশ্ব সম্রাট বলে লইতে পারেন নাকি ?

এই অপমান-বাক্যে ক্ষত্রিয়-শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বুঁদিরাজ উত্তর করিলেন “এ দেহে প্রাণ থাকিতে সম্রাট পাথারকে পাইবেন না। সম্রাটকে বলিবেন, ক্ষত্রিয় মৃত্যু ভয় করে না।”

আসফখাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন “মহারাজ দেহে প্রাণ থাকিতে যেন পাথারকে দিবেন না, কিন্তু দেহে প্রাণ রাখিবেন কতক্ষণ ? সিংহের বিবরে বসিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ কি সম্ভব ? কেন অনর্থক প্রাণ হারাইবেন, একটু বিবেচনা করিয়া উত্তর দিন।”

বুঁদিরাজ এ কথার সত্যতা অনুভব করিলেন। কি

করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে আসফ খাঁ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, সম্রাটকে কি বলিব ?"

বুঁদিরাজ বলিলেন, "আচ্ছা ১৫ দিনের মধ্যে আমি অশ্ব লইয়া স্বয়ং মহারাজের নিকট উপস্থিত হইব।"

(৩)

মন্ত্রী চলিয়া গেলেন,—বুঁদিরাজ বিষণ্ণ মনে আপনার উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রাণাধিক পাথারকে দিতে পারিবেন না ; কিন্তু না দিলেই বা উপায় কি ? আসফ খাঁ ঠিক বলিয়াছে, ইচ্ছায় না দিলে সম্রাট বল-পূর্ব্বক ইহা লইবেন। তিনি সিংহের কবলে আসিয়া পড়িয়াছেন। পলাইবার উপায় নাই। নিজে একাকী পাথারকে লইয়া গুপ্তভাবে পলাইতে পারেন কিন্তু তাহা হইলে কুমার সমর্ষির দশা, তাঁহার সৈন্যবর্গের দশা কি হইবে ? সম্রাটের ক্রোধে কি তাহারা রক্ষা পাইবে ? তাহাদের উদ্ধারের উপায় স্থির করিবার জন্যই তিনি ১৫ দিন সময় চাহিয়াছেন, —এখন উপায় কি ? দেবসিংহ নিরুপায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, এই সময় কুমার সমর্ষি আসিয়া বলিলেন— "সম্রাট-পুত্র বিবাহ করিতে যাইবেন আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন।"

রাজার মুখ এই কথায় সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে যাইতে হইবে, বিবাহ কবে ?"

কুমার বলিলেন "বিবাহের আর এক মাস আছে মাত্র। ১৫ দিনের মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে।"

রাজার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি উদ্ধারলাভের এক উপায় দেখিলেন। পুত্রকে আসফ খাঁ কথিত সম্রাটের ঘৃণা প্রস্তাব আনুপূর্ব্বিক বলিয়া বলিলেন—"বৎস, সম্রাট-পুত্র যে তোমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতে চাহিয়াছেন ইহাতে বিধাতার হস্ত দেখিতেছি। নহিলে আমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় ছিল না। তুমি অধিকাংশ সৈন্য সঙ্গে লইয়া যুবরাজের সহগমন কর এবং আমাদের অবশিষ্ট সেনাবর্গও মুসলমান বেশে নব সংগৃহীত বরযাত্রী-সৈন্যদল ভুক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ করুক। তাহার পর আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তোমাদের অনুসরণ করিব।"

(৪)

বুন্দিরাজের পুত্র এবং সৈন্যসামন্ত সকলেই সম্রাট-পুত্রের সহিত চলিয়া গিয়াছেন। বুঁদিরাজও ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্তু সম্রাটকে কথা দিয়াছেন

১৫ দিনের দিন অশ্ব লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাই এখনও প্রাণাধিক পাথারকে লইয়া আপনি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। আজ তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার অভিপ্রায়ে পাথারের পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রাসাদ দ্বারে আসিয়া প্রহরীকে বলিলেন "সম্রাটকে সংবাদ দাও, অশ্ব লইয়া বুঁদিরাজ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন"।

সম্রাটও উৎসুকচিত্তে বুঁদিরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পাথারকে দেখিয়া অবধি সম্রাট তাহাকে অধিকার করিতে লোলুপ। আসফখাঁর কথা ঠিক। সম্রাটের অশ্বশালে বাস্তবিক অমন একটি অশ্ব নাই। দেবসিংহ যে ১৫ দিন সময় চাহিয়াছেন সম্রাটের তাহাও বড়ই দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে, তবে আসফখাঁর অনুরোধে এই কয়েকদিন কোনরকমে ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন। আজ শেষদিন, আর ধৈর্য্য ধরিতেছে না, কখন বুঁদিরাজ আসিবেন তাহাই ভাবিতেছেন; এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বুঁদিরাজের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সম্রাট মহাহর্ষে স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার জন্য এত বড় একটা ত্যাগ স্বীকার যে লোক করিতেছে তাহার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও ত মনে স্বতঃ উদিত হয়। বুঁদিরাজ অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে অশ্ব লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি"।

সম্রাট লোলুপদৃষ্টিতে অশ্বের প্রতি চাহিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "আপনার উপহারে প্রীত হইলাম। আমি আপনাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিব। পদমর্য্যাদায় আপনিই রাজপুতানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইবেন।"

সম্রাটের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবসিংহ বলিলেন "বাদশাহ আমার একটা কথা শুনুন, মনে রাখিবেন, রাজপুতের নিকট তিনটী জিনিস কখনও চাহিবেন না, স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি।"

এই কথা বলিয়া দেবসিংহ অশ্ব ধাবিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসিনী

(১)

নদীতীরে সুবিস্তৃত শ্মশান-প্রান্তে ভস্মাবশেষ চিতার সম্মুখে কে ঐ দীনবেশা, আলুলায়িত-কুন্তলা মলিনমুখী রমণী বসিয়া? ও বুঝি সন্ন্যাসিনী? ঐ নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ চিতা-ভস্মের মত তাহার হৃদয়ও বুঝি আজ সুখদুঃখহীন? আপনার মর্ম্মশোণিতে ঐ চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া জীবন্তে বুঝি আজ ও জীবনহীনা? হায়! সবে মাত্র যে কচি হৃদয় নবীন প্রেমে, নবীন আশায়, নবীন বাসনায় মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কে জানিত সূর্য্য না অস্ত যাইতেই শুষ্কপত্রের মত এইরূপ ঝরিয়া পড়াই তাহার পরিণাম!

যখন নলিনী ফুলের মতন মুখটি লইয়া, বাল্যসখা কুমারের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে এই নদীতীরে বসিয়া গল্প করিত, নদীর জলে ফুল ভাসাইয়া, ছোট ছোট পা দুখানি দিয়া ঢেউ গুলির সঙ্গে সঙ্গে ফুল-গুলি নাড়াইয়া দিত নদীর জলে নামিয়া দুজনে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইত তখন কে জানিত তাহার এই পরিণাম!

সে দিনও যখন এই নদীতীরে বসিয়া কুমার তাহাকে তাহাদের ভবিষ্যৎ কাহিনী শুনাইতেছিলেন, কল্পনাপটে সুখের ছবি আঁকিয়া দেখাইতেছিলেন তখন নলিনী কি

একবার স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কল্পনা কেবল কল্পনাতেই অবসান হইবে!

সে দিন বসন্তের প্রভাত, নদীর চঞ্চল বুকে রবিকিরণ তরঙ্গভঙ্গে খেলা করিতেছে, নদীর ধারে মুকুলিত আমের গাছে একটি পাপিয়া সুর ভাঁজিতেছে, তলায় কুমার ও নলিনী বসিয়া আছেন। নলিনীর মুখখানিতে আজ হাসি নাই—তাহার চোখে জল। মিবার-সেনাপতি অজয়সিংহ এই উপত্যকা পথ দিয়া যবন সেনাপতি মহবুবখাঁর গতিরোধ করিতে যাত্রা করিবেন, কুমার সেই অবকাশে তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন,—এই সংবাদে নলিনী কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একবৃন্তে দুইটি ফুলের মত তাহারা পাশাপাশি বাড়িয়াছে, কুমার গেলে নলিনী একাকী কি করিয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া নলিনীর নয়নে অশ্রুজল।

কুমার নলিনীর চোখ মুছাইয়া বলিলেন, নলিনী কাঁদিতেছ কেন? আমি আবার শীঘ্রই আসিব।" নলিনী উত্তর করিল না—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নীরবে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমার আবার বলিতে লাগিলেন—"যখন শত্রু নিপাত করিয়া মহারাজের নিকট হইতে জয়মাল্য পুরস্কার আনিয়া তোর চুলে পরাইয়া দিব—তখন—" বলিতে বলিতে কুমারের মুখ উদ্দীপ্ত, চক্ষু সজল অথচ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তাঁহার আজন্মের আশা কল্পনার সফলতা যেন তাঁহার নয়নে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর একবার

কেবল আস্তে আস্তে বলিলেন—"তখন নলিনী তখন—"?
নলিনী সজল-নেত্রে একটু হাসিল, কুমারের আর কোন কথা বলা হইল না, তাহার হাতখানি দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া আনন্দ-বিহ্বল নেত্রে মুগ্ধের মত তিনি কেবল তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কত সময় বহিয়া গেল—তাঁহারা বুঝিতেও পারিলেন না; সহসা উপত্যকা পথে সৈন্য কোলাহল, অশ্বপদশব্দ, বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল, কুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"ঐ বুঝি রাজধানী হইতে সৈন্য আসিতেছে, নলিনি, নলিনি দেখ্‌বি আয়—"

দুইজনে উঠিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

(২)

আজ এই ক্ষুদ্র উপত্যকা গ্রামের প্রাণে উত্তেজনা-আনন্দের সীমা নাই। রাজধানী হইতে সৈন্য আসিয়াছে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণী বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বর্শাফলকে রৌদ্রকিরণ পড়িয়া ঝকমক করিতেছে। ঔৎসুক্যব্যাকুল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা পথপ্রান্তর জনতাময় করিয়া তুলিয়াছে। গৃহের ছাদ, এমন কি গাছের ডালও জনশূন্য নহে। মাতৃবক্ষস্থিত নিদ্রিত শিশু কোলাহলে জাগরিত হইয়া এই বিস্ময়দৃশ্য

দর্শনে কাঁদিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। নলিনীও এই সৈন্যসমারোহ দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে জনস্রোত তাড়নে কুমার কখন যে তাহার পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা বালিকার মুগ্ধ নেত্রে ভয় বিহ্বল চকিত কটাক্ষ প্রকটিত হইল, তাহার ক্ষীণদেহ লতিকার মত কম্পিত হইয়া উঠিল, সে দেখিল—একটি আরোহীহীন অশ্ব জনতা ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে দ্রুত গতিতে এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ আর দুঁ একটি উন্মত্ত লম্ফ, আর দু একটি মুহূর্ত্ত—তাহার পর এখনি সে অশ্বপদে দলিত হইয়া যাইবে। বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেইখানেই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পড়িতে না পড়িতে একজন অশ্বারোহী পুরুষ নিমেষের মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন।

বালিকা মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিল, সে তাহার পিতৃগৃহে শয়ান, নিকটে এক অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষ ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া।

(৩)

কুমার একাকী বসিয়া আছেন, নদীর ধারে বকুলের তলাটি ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে, নলিনী এখনো মালা

গাঁথিতে আসে নাই,—কুমার একাকী বসিয়া আছেন। এখন আর নলিনী আগেকার মত প্রত্যহ এখানে খেলিতে আসে না, যদি কোন দিন আসে, তেমন করিয়া আর কুমারের সঙ্গে গল্প করে না, ফুল কুড়াইয়া, মালা গাঁথিয়া, আর কুমারকে আগের মত পরাইয়া দেয় না, কুমার তাহাকে ফুল পরাইয়া দিলে সে আর হাসিয়া উৎফুল্ল নয়নে তাহার দিকে তেমন করিয়া চাহে না, কুমারের সহস্র চেষ্টায় তাঁহার মুখে আর পূর্ব্বের সেই সরল অনুরাগের হাসি ফুটিয়া উঠে না—কিন্তু অজয়সিংহকে দূর হইতে দেখিলে তাহার এ ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নয়নের স্বাভাবিক জ্যোতি, অধরের অনুরাগ হাসি, আপনা হইতে আবার বিকাশিত হইয়া উঠে।

কুমার ও নলিনী ছেলেবেলা হইতে দুজনে একত্র বাড়িয়াছেন—একত্র খেলিয়াছেন, দুজনের জীবন অচ্ছেদ্য ডোরে গ্রথিত ভাবিয়াছেন। তাঁহাদের দুজনের হৃদয় দুজনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল না, কাহারও প্রেমে কাহারও অবিশ্বাস ছিল না, তবে যে এতদিন বিবাহ হয় নাই, সে কেবল কুমার ভাবিয়াছিলেন নলিনীর যোগ্য হইয়া তবে নলিনীর পিতার নিকট তাঁহাকে ভিক্ষা চাহিবেন; এইবার যখন তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার দিন উপস্থিত, যুদ্ধ শেষে বীরত্ব গৌরব আনিয়া নলিনীর চরণে উপহার দিয়া তাহার হাত হইতে বরমাল্য

গ্রহণ করিবেন এইরূপ যখন আশা করিতেছেন, তখন তাঁহার সে আশা সে স্বপ্ন বজ্রাঘাতে সহসা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগরিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, নলিনী আর তাঁহার নাই—নলিনী অজয়সিংহের!

কুমার একাকী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, আর নলিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যুদ্ধে যাইবার আগে একবার তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা। তাহার পর—ভুলিতে পারেন, দেশে ফিরিবেন, নহিলে এই শেষ দেখা। কেনই বা ভুলিতে পারিবেন না, তাঁহার জীবনের একটি আশা-আলো নিভিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাই কি তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব? সমরক্ষেত্রে যশস্বিতা লাভ করা তাঁহার আর একটি আশৈশব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, বাল্যকালে মাতৃ ক্রোড়ে বসিয়া দুষ্ট যবনদিগের অত্যাচার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, শত্রু শোণিতে রঞ্জিত হইয়া পিতার ন্যায় "বীর" নাম লাভ করিতে মর্ম্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। নলিনীর প্রেমও তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই, বরঞ্চ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, কেননা যশ-গৌরবই তিনি নলিনীলাভের উপায়-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং এতদিন যশের আকাঙ্ক্ষা প্রেমাকাঙ্ক্ষায় মিলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব রাসায়নিক উপাদান গঠিত করিয়াছিল, সহসা অজয়সিংহ মধ্যে আসিয়া

তাহাদের সে একত্ব নাশ করিয়া দিলেন, একমাত্র যশাকাঙ্ক্ষাই এখন কুমারের হৃদয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে, কেননা প্রেমাকাঙ্ক্ষা আর তাঁহার পূর্ণ হইবার নহে। নলিনী এখন অজয়কে ভালবাসে! নলিনী এখন অজয়ের বাক্‌দত্তা,—যুদ্ধ শেষে অজয়সিংহ এখানে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবেন।

কুমার একাকী বসিয়া আছেন, নদী পূর্ব্বের মতই কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে, আকাশ অপরাহ্নের সুবর্ণ আলোকে পূর্ব্বের মতই রঞ্জিত হইয়া নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, আর বট বৃক্ষের একটি আনত প্রকাণ্ড শাখা প্রতিদিনের মত আজও সেই সুবর্ণ স্রোতের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, কুমার সেই তরঙ্গিত ছায়ালোকের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া আছেন। অপরাহ্নের লোহিত আভা যখন মিলায় মিলায় তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার উপর আর একটি ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল, কুমারের হৃদয় সশব্দে উঠিতে পড়িতে লাগিল, তিনি কিছুক্ষণ সেই ছায়ার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—পশ্চিমাকাশের প্রশান্ত লোহিতাভা নলিনীর অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ মুখ মধুরভাবে উজ্জ্বল করিয়াছে, নলিনী আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে। নলিনীর

অশ্রুজল কুমারের প্রাণে পূর্ব্বে কখনও সহে নাই, আজও সহিল না, তিনি নিজের দুঃখ ভুলিয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নলিনী কাঁদিতেছ কেন?

কুমার যে নলিনীকে ভালবাসেন, এক দিন যে নলিনীও তাহাকে ভালবাসিত, তাহার অনুরাগ এখন ভিন্ন পাত্রে অর্পিত দেখিয়া কুমার যে ব্যথিত হইতে পারেন, এ সকল তাহার কিছুই মনে আসিল না, সে কেবল আকুল-হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাসভবে তাহার বাল্যসখার নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিয়া কহিল "কুমার, অজয় যুদ্ধে যাইতেছেন, আর বুঝি আমাদের দেখা হইবে না।"

কুমারের মর্ম্মতল হইতে ধীরে ধীরে একটি রুদ্ধ নিশ্বাস নির্গত হইল, কুমার প্রাণপণে সংযত হইয়া সবলকণ্ঠে বলিলেন—"হইবে বই কি?"

(২)

আর আশা নাই, অজয়সিংহ আর শত্রুর গতিরোধে অসমর্থ, পঙ্গপালের মত শত্রুসৈন্য মিবার-সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। হতবুদ্ধি, বিশৃঙ্খল সৈন্যগণ, কেহ দাঁড়াইয়া বর্শার আঘাত সহ্য করিতেছে, কেহ শূন্যে তরবারি চালনা করিতেছে, কেহ সেনাপতির অনুজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলায়নপর হইতেছে, হিন্দুসৈন্যের চারিদিকে এমনি একটা

আতঙ্ক, নৈরাশ্য-হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। অজয়সিংহ নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। যবন সৈন্যের মধ্যে সগর্ব্ব জয়ধ্বনি উঠিল। কুমারসিংহ এতক্ষণ তাঁহার সহস্র সৈন্য লইয়া অন্য দিকে শত্রুদমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের পরাভব করিয়া তিনি এই সময় অজয়সিংহের সাহায্যে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার বিজয়ী সৈন্যের হুহুঙ্কারে অজয়সিংহের পলাতক ভীত সৈন্যগণ পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল, কুমার জয়োন্মাদে সৈন্যদল হইতে সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অনুজ্ঞা করিতে লাগিলেন, উৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া প্রবল প্রতাপে তাহারা অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। ভাগ্যস্রোত ফিরিল। যবন সেনাপতি মহবুবখাঁ পলাতক হইলেন। এবার তাঁহার সেনাদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, তাহারাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। কুমার সিংহ পলাতক শত্রুসেনাপতির অনুবর্ত্তী হইয়া অশ্বচালনা করিলেন। মহাবুবখাঁর আহত অশ্ব কিছুদূর গিয়া ভূপতিত হইল, কুমার সিংহ নামিয়া যবন সেনাপতির নিকটে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন সেনাপতি সংজ্ঞাহীন। অনুবর্ত্তী সৈন্য কয়েকজনের প্রতি তাঁহাকে উঠাইয়া লইবার ভার দিয়া তিনি তখন শিবিরাভিমুখী হইলেন। অর্দ্ধপথে এক বৃক্ষতলে অজয়সিংহকে দেখিয়া তিনি সেই দিকে অশ্ব চালিত করিলেন, বুঝিলেন, তিনি আহত হইয়া

এই খানে অসহায় পড়িয়া আছেন। কুমার অশ্ব হইতে সবে মাত্র নামিয়াছেন, অজয়সিংহ ও তাঁহার মধ্যে দুই তিন হাত ভূমি মাত্র ব্যবধান, এই সময়ে দেখিলেন—দূর হইতে একজন যবনসেনা অজয়ের প্রতি বর্শা লক্ষ্য করিতেছে —তিনি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া অজয়কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে বর্শা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল,—তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। নলিনীর বিদায় দিনের সেই অশ্রুমুখ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

(৫)

যুদ্ধ জয়ের পর অজয়সিংহ সসৈন্যে রাজধানীতে আসিয়াছেন। আহত কুমারও এখানে আনীত হইয়াছেন, বর্শাঘাতে তাঁহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় নাই, তবে বাঁচিবার আশা অতি অল্প

সংসার ভোজবাজি, অদৃষ্ট বাজিকর কি কৌশলে যে এই বাজি খেলিতেছেন তাহা বুঝা দেবতার অসাধ্য মানুষের কি কথা। কুমারের জন্যই যুদ্ধ জয় হইয়াছে, কিন্তু সেনাপতি অজয়সিংহেরই যশঃগৌরবে রাজধানী ধ্বনিত! ক্ষমতাব প্রভাব সর্ব্বত্র, তাহার বিপক্ষে কারও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে অক্ষম, সুতরাং কুমারের সৈন্যগণও এই প্রশংসার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না, কি জানি তাহা শুনিলে

অজয় সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাহাদের শাস্তি প্রদান করেন। প্রথম প্রথম তাহারা সত্য কথাটা বলিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু রাজধানীর লোক তাহা শুনিলে হাসে, সে কথা বিশ্বাস করে না, আর অজয়সিংহের সৈন্যগণ তাহা শুনিয়া শাসাইতে থাকে, সুতরাং তাহার পর হইতে তাহারা আপনাদের মধ্যে কানাকানি করে, কিন্তু প্রকাশ্যে অজয়-সিংহের প্রশংসাবাদে জয়ধ্বনি তুলে। কুমার শয্যাগত, ক্ষমতার রাজ্য হইতে তিনি দূরে পড়িয়া, তাঁহার পক্ষ হইয়া কে এখন সম্ভাবিত দুঃখ স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত!"

আজ রাজধানীতে মহোৎসব, মহারাজ আজ সেনাপতিকে পুরস্কৃত করিবেন। দুর্গপ্রাঙ্গণে সভা বসিয়াছে, শত শত সৈন্য, নাগরিক, সভা বেষ্টন করিয়া উৎসুক চিত্তে দণ্ডায়মান! রাজা যখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হীরকশীর্ষ-তরবারি কোষমুক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সেনাপতি অজয়সিংহ, তোমার জন্যই আজ মিবার শত্রুমুক্ত, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার যোগ্য পুরস্কার ইহা নহে, ইহা কেবল—"

রাজার কথা শেষ না হইতে দর্শকমণ্ডলীর জয়-ধ্বনিতে দিক্ বিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সেই জয়ধ্বনি শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে একজন বৃদ্ধ সৈনিক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"মহারাণা, রাজাধিরাজ, আপনি যে কার্য্যের জন্য যাহাকে পুরস্কার দিতেছেন,

তিনি তাহার যথার্থ অধিকারী নহেন। অজয়সিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যখন সন্ধিস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু কুমারসিংহ নিজ বাহুবলে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন।”

চারিদিক বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, অজয়সিংহের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল, মহারাজ অজ্ঞাতভাবেই যেন অসি কোষবদ্ধ করিয়া অজয়সিংহকে বলিলেন—“সেনাপতি, ইহার মধ্যে কিছু কি সত্য আছে ?

অজয়সিংহের রক্তবর্ণ মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া পড়িল, ক্ষত্রিয় হইয়া মিথ্যা বাক্য তাহার মুখ হইতে কিরূপে নির্গত হইবে ? কিন্তু যে যশ যে গৌরব নিজের বলিয়া ভোগ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এতক্ষণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যের ধন বলিয়া মনে হয় নাই, হঠাৎ কি করিয়া তাহা চোরের ন্যায় ত্যাগ করিবেন ? অজয়সিংহ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বলিলেন—“মহারাজ, যিনি আমাকে অপরাধী করিতেছেন—তিনি আমার দোষের প্রমাণ দান করুন, নিজের পক্ষে নিজে বলিলে তাহা প্রামাণ্য হইবে না,”—

অজয়সিংহের এই মহত্বের পরিচয়ে সভাসদ সকলেই সাধুবাদ করিল, মহারাজ বক্তা-সৈনিককে বলিলেন—সৈনিক তোমার প্রভু যে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ কি ?”

রণজিৎ সত্যের বল কণ্ঠে ধারণ করিয়া বলিল—"প্রমাণ আমার কথা, আমি ক্ষত্রিয়"।

মহারাজ। "সত্য, কিন্তু অজয়সিংহও ক্ষত্রিয়, তোমার কথা সত্য হইলে তিনি চোর হইয়া পড়েন।"

রণজিৎ ক্রোধ দমন করিতে পারিল না, বলিল—অজয়সিংহ চোর হইতেও অধম, কুমারসিংহ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

মহারাজ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"সৈনিক, চুপ কর; ইহা রাজসভা, গালি দিবার স্থল নহে, প্রমাণ যদি কিছু দিবার থাকে বল, নহিলে চলিয়া যাও—"

রণজিৎ বলিল—"প্রমাণ কুমারসিংহের দুই সহস্র সৈনিক।"

মহারাজ। "দুই সহস্রের আবশ্যক নাই, দুইজনকে ডাক"।

রণজিৎ সেনা দুইজনকে ডাকিতে যাইতেছে, রাজা বলিলেন, "তোমায় ডাকিতে হইবে না, প্রহরি, তুমি যাও, ডাক"।

প্রহরী জন-মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"কুমার সিংহের সৈন্যগণ কোথায়? তাহাদের মধ্যে দুইজন এদিকে এস, সাক্ষী দিতে হইবে।"

কুমারসিংহের সৈন্যগণের ত্রাস উপস্থিত হইল, বুঝিবা অজয়সিংহের বিরুদ্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছে

তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিচার হইবে,—প্রথমে সাক্ষ্য, তাহার পর প্রাণদণ্ড। প্রহরীর ডাকে কেহ কোন উত্তর করিল না, আবার প্রহরী ডাকিল, "কুমার সিংহের সৈন্য দুইজনকে মহারাজা ডাকিতেছেন, অগ্রসর হও"। চৌদিক নিস্তব্ধ, কেহ এক পদ অগ্রসর হইল না। প্রহরী ফিরিয়া গিয়া কহিল, কুমার সিংহের কোন সেনা সম্ভবতঃ এখানে নাই, ডাকিয়া কোনই উত্তর পাওয়া গেল না।" রণজিৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। মহারাজ বলিলেন, "সৈনিক, তোমার অন্য কোন প্রমাণ আছে ?"

সৈনিক বলিল—"প্রভু কুমারসিংহ স্বয়ং ইহার প্রমাণ, তাঁহার সাক্ষী লওয়া হউক।"

অজয়সিংহ বলিলেন—"কিন্তু তিনি এখন শয্যাগত এখানে তাঁহাকে আনিলে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে"।

সৈনিক বলিল—"ক্ষত্রিয়ের জীবন অপেক্ষা তাহার নাম, বীরত্ব, যশ অধিক মূল্যবান, তাঁহার নামরক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আনা হউক—"।

মহারাজ বলিলেন, আচ্ছা তাঁহাকে শিবিকা করিয়া এখানে আনয়ন কর"—।

রণজিৎসিংহ দুই জন প্রহরী সঙ্গে লইয়া কুমারকে আনিতে গমন করিল। প্রহরী-দুইজনকে একখানি মুক্ত শিবিকা আনয়নের ভার দিয়া রণসিং যখন কুমারসিংহের

কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন কুমার বলিলেন—"রণজিৎ সিং তুমি কোথায় গিয়াছিলে, আমি সেই অবধি তোমায় ডাকিতেছি কাহারো সাড়া নাই"। রণজিৎসিং বিষণ্ণমুখে বলিল—"প্রভু, শুনিলাম আজ অজয়সিংহ রাজহস্ত হইতে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার পাইতেছেন। যিনি যথার্থ বিজয়ী তিনি শয্যাগত তাঁহার নাম কাহারও মুখে নাই, আর অজয়সিংহ ভীরু পাষণ্ড আজ মিথ্যাগৌরব লাভ করিতেছে। তাহা শুনিয়া সহ্য হইল না, আপনাকে একাকী রাখিয়াও তাই রাজসভায় সত্য প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম।"

কুমার বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, কুমারের যশ অজয়সিংহ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেছেন!

রণসিং বলিল—"প্রভু, আমার কথা মহারাজ বিশ্বাস করিলেন না, আপনাকে সাক্ষী দিতে যাইতে হইবে,"।

ক্রোধে কুমারসিংহের তখন সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান! তাঁহার নলিনীকে লইয়া অজয়সিংহ ক্ষান্ত নহেন, নিজের ক্ষমতায় নিজের পরিশ্রমে তিনি যে যশ যে নাম লাভ করিয়াছেন, চোরের মত তাহা হইতেও তিনি তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত। মনের অতিরিক্ত আবেগে তিনি সবলে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, বক্ষের আহত স্থান রক্ত-প্লাবিত হইয়া উঠিল, আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন "রণসিং শিবিকা এখনি আন আমি সভায় যাইব।"

রণসিংহের চক্ষে জল আসিল, সে বলিল— "শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছি।"

কিছু পরে কুমারকে বহন করিয়া একখানি মুক্ত শিবিকা রাজসভায় আসিয়া পৌছিল। কুমারের সেই ক্ষীণ অথচ উদার বীরমূর্ত্তির প্রতি সকলের চক্ষু পড়িল, কুমার কেবল অজয়সিংহের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

কুমারের শিবিকা মহারাজের অতি নিকটে আনীত হইলে মহারাজ বলিলেন,—"কুমারসিংহ, তুমি মৃত্যু শয্যায় শয়ান, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে পৃথিবীর মান, যশ, তোমার সঙ্গে যাইবে না, সত্য মাত্র এখন তোমার সাথের সাথী, এই বুঝিয়া তুমি বল অজয়সিংহ বিজয়ী না—তুমি!"

কুমারসিংহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একবার অজয়ের শুষ্ক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল "একবার ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন এইবার ইহাকে প্রতিশোধ দিবেন? কিন্তু প্রতিশোধ! ইহা কাহার প্রতি প্রতিশোধ হইবে? অজয়ের প্রতি না নলিনীর? অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিলে কাহার জীবনের সুখ নষ্ট হইবে? নলিনীর পিতা একথা শুনিবার পর যদি অজয়কে জামাতা না করেন ত কাহার হৃদয় চিরনৈরাশ্যে দগ্ধ হইবে? কিম্বা বিবাহের পর নলিনী কখনও যদি অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিতে

পায়, যদি জানিতে পারে সে প্রতারক চোর, তাহাহইলে তাহার কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! বিদায় দিনের নলিনীর সেই অশ্রুপূর্ণ বিষণ্ণ মুখ কুমারের মনে আবার জাগিয়া উঠিল, কুমারের আর সত্য বলা হইল না, তিনি বলিলেন,—"মহারাজ আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, প্রলোভন সম্বরণ করা মানুষের দুঃসাধ্য।"

মহারাজ বলিলেন—"এই মৃত্যু শয্যাতে শুইয়াও।"

কুমার। "হাঁ"।

মহারাজ। "তবে আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অজয়সিংহকে পুরস্কার প্রদান করা হউক।"

কুমার। "হউক"।

মহারাজ তখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন—"অজয়সিংহ বিজয়ী,—আর কোন সন্দেহ নাই।"

অজয়সিংহের নামে চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল, কুমার সিংহ হৃদয়ের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া মৌন হইয়া তাহা শুনিলেন, তাঁহার বীরত্ব-গৌরব অন্যের নামে ধ্বনিত হইল, তাঁহার প্রাণের বিফল আকাঙ্ক্ষা প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তুলিল! তিনি রণজিৎকে কহিলেন "শীঘ্র আমাকে এখান হইতে লইয়া চল"।

বাহক শিবিকা তুলিল, রণসিংহ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার অনুগামী হইল, তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মনে মনে নলিনীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অজয়সিংহের কটিদেশে উপহারতরবারি বাঁধিয়া কহিলেন—"অজয়সিংহ তুমি যে মহাকার্য্য সাধিত করিয়াছ—সামান্য ধনরত্ন তাহার যোগ্য পুরস্কার নহে, আমার গৃহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসামান্য রত্ন যাহার জ্যোতিতে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোকিত তাহা তোমাকে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিব।"

সেই দিনই রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

(৬)

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, অজয়সিংহ মহাবিজয় লাভ করিয়াছেন, একথা নগরে গ্রামে রাষ্ট্র। তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া নলিনীর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, গর্ব্ব-বিস্ফারিত উৎসুক হৃদয়ে সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে চলিল, তাঁহার আসিবার কোন লক্ষণ নাই, তাঁহার পত্রাদিও অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে! নলিনীর ফুল্ল-মুখ দিন দিন শুকাইয়া আসিতে লাগিল, তাহার বিস্মিত হৃদয়ের আশা দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। যে উপত্যকা ভূমিতে প্রথমে সে অজয়কে দেখিয়াছিল, প্রতিদিন সে সেইখানে একটি নিভৃত তরুতলে গিয়া বসে, মুহূর্ত্তে

মুহূর্ত্তে দূরোত্থিত অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠে, অবশেষে সন্ধ্যাকালে হতাশ ক্লান্তহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে। একদিন তাহার অনুমান সত্য হইল, তাহার কল্পিত অশ্বপদ ধ্বনি শূন্যে বিলীন না হইয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, নলিনীর আনন্দপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অবশেষে একটি ক্ষুদ্রসমারোহ প্রতিভাত হইল। দেখিল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈনিক একখানি সুসজ্জিত শিবিকার অগ্র-পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। শিবিকা যে বরবেশী অজয়সিংহকেই বহন করিয়া আনিতেছে তাহাতে বালিকার আর সন্দেহ রহিল না।

শিবিকা একটি বৃক্ষতলে নামিল, বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বর শিবিকা হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আর বিলম্ব সহিল না, সে দ্রুত পদে কম্পবান্ হৃদয়ে শিবিকার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল শিবিকার অর্দ্ধরুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া রণসিংহ ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রণসিংহ কুমারের ভৃত্য, তাহাকে বালিকা চিনিত। কুমারের ভৃত্য অজয়সিংহের ভৃত্য হইয়া কেন আসিয়াছে ইহা তাহার তখন মনেই হইল না। মনের আগ্রহে সে শিবিকার অন্য পার্শ্বে গিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সমস্ত মস্তক তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শিবিকাশায়ীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, অজয় নহেন, শিবিকার মধ্যে

কুমার শুইয়া আছেন, তাঁহার মুখে মৃত্যুর প্রশান্তি বিরাজমান্।

নলিনী সব শুনিয়াছে, রণসিংহ তাহাকে কুমারের আমৃত্যু বিবরণ, অজয়সিংহের শঠতা সমস্ত খুলিয়া বলিয়াছে, নলিনী এখন সন্ন্যাসিনী। শ্মশান তাহার বাসস্থান, কুমারের চিতাভস্ম তাহার একমাত্র উপভোগ্য দর্শনীয় বস্তু।

প্রতিশোধ

(১)

শীতের সন্ধ্যা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক কালীপ্রসাদ গঙ্গাতীরের এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত দিন উপবাস-পীড়িত, বহু-পর্য্যটনে পবিশ্রান্ত, সম্মুখে সুদীর্ঘ অন্ধকার রজনী, কোথায় যাইবে—তাহার আশ্রয় কোথা ?

সুদূরে চিতা জ্বলিতেছিল ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে, প্রতিশোধ-স্পৃহায় সেই চিতার মতই তাহার হৃদয় দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পিতার প্রতিদিনের কষ্ট, তাঁহার অর্দ্ধ অনশন, তাঁহার অকাল মৃত্যু, এবং মৃত্যুকালের প্রত্যেক কথা তাহার মনে পড়িতেছে, আর ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা ভুলিয়া 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ' বলিয়া সে ভূমে পদাঘাত করিতেছে।

মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, চিতাগ্নি ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতে লাগিল, বালক বৃষ্টিতে আর্দ্র, শীতে কম্পমান্ হইয়া দ্বিগুণ ক্রোধপ্রজ্বলিত হৃদয়ে শপথ করিতে লাগিল, "প্রতিশোধ প্রতিশোধ! আমাদের এ দশা যে করিয়াছে হে ভগবন তাহার দণ্ডবিধান কর প্রভু।"

ভিজিতে ভিজিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, শপথ করিতে

করিতে বালক উঠিল, অদূরের দীপালোক লক্ষ্য করিয়া সেই পথে চলিতে লাগিল, দীপালোক এক রুদ্ধ মন্দিরের ছিদ্র পথে প্রকাশিত হইয়াছিল, বালক তাহার প্রাঙ্গণে আসিয়া মন্দির-সংলগ্ন আচ্ছাদনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে নিদ্রামগ্ন হইল। স্বপ্নে দেখিল, পিতা সৌম্য মূর্ত্তিতে প্রসন্নভাবে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন—"বৎস—উঠ, অসহায়ের সহায়, অন্যায়ের বিচারক স্বয়ং ভগবান, তোমার কোন ভয় নাই।" বালক প্রতিশোধ প্রতিশোধ বলিয়া জাগিয়া উঠিল, উঠিয়া দেখিল, তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া সত্যই কে তাহার নিকটে দণ্ডায়মান। বালক চমকিয়া উঠিয়া বসিল, সত্যই কি তাহার পিতা আসিয়াছেন না কি! তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, অপরিচিত ব্যক্তি বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, দীপালোকে হঠাৎ যেন সেই স্বপ্ন দৃষ্ট স্নেহময় মুখই তাহার নয়নে পড়িল। সে উঠিয়া বসিতেই অপরিচিত জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস তুমি কে?"

"আমি ব্রাহ্মণ কুমার"—

"একাকী এখানে?"

"আমার কেহ নাই—আমি অনাথ।"

সম্প্রতি অপরিচিতের একটি পুত্র মরিয়াছে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'বৎস তোমার নাম কি?'

"কালীপ্রসাদ।"

"কালীপ্রসাদ! বৎস, কালী এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তুমি আজ হইতে আমাকে পিতা বলিয়া জানিও।"

(২)

কালীপ্রসাদের আর দুঃখ কষ্ট নাই, মন্দিরপতি দেবীপ্রসন্নের মৃত পুত্রের স্থান সে অধিকার করিয়াছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসেন। দেবীপ্রসন্নের যে দুইটি পুত্র কন্যা জীবিত তাহারাও যুবকের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহশীল, কন্যা মেঘমালা দেবী-প্রসাদের বাগ্দত্তা।

কালীপ্রসাদের এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহাতে সহজেই লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করে। তাহার একটি প্রধান গুণ, সে করুণহৃদয়। দীন দুঃখী অনাথ আতুরের কষ্ট নিবারণ করিতে সে সর্ব্বদাই সচেষ্ট, তাহার করুণায় ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগের দিনও নিরাশ্রয় পথিকের জন্য মন্দির দ্বার উন্মুক্ত থাকে। এই সহৃদয়তায় পাড়াপ্রতিবাসী, পরিচিত অপরিচিত সকলেই তাহার প্রতি প্রসন্ন, সে সর্ব্ব সুখে সুখী। কিন্তু এই সুখের অবস্থাতেও তাহার পূর্ব্ব শপথ সে বিস্মৃত হয় নাই, প্রতিশোধ স্পৃহা তীব্রভাবে এখনও তাহার মনে জাগরূক। প্রতিদিন সে নিস্তব্ধ নিশায় একাকী

মন্দিরে গিয়া কালী বন্দনা করে এবং প্রতিশোধ ভিক্ষা চাহে। মনুষ্য-স্বভাব কি বিচিত্র বিরোধীভাবাপন্ন, অন্যের প্রতি একদিকে যে করুণাশীল, ন্যায়গত অধিকার দানে যে আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত, প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থের জন্য সে বজ্রকঠোর।

সম্প্রতি দেবীপ্রসন্নের বালক পুত্র রোগ-শয্যায় শয়ান, পিতামাতার কষ্টের সীমা নাই, অনেকগুলি পুত্র কন্যার মধ্যে সবেধন নীলমণি এই দুইটি পুত্র কন্যামাত্র তাঁহাদের বর্ত্তমান, সুতরাং দুশ্চিন্তায়, ঔৎসুক্যে তাঁহারা মুমূর্ষুবৎ। তাঁহাদের বিশ্বাস কালীপ্রসাদ কালীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন, সুতরাং বালকের মঙ্গল উদ্দেশে দেবীকে প্রসন্ন করিবার ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে।

কালীপ্রসাদ হোম করিতেছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতেছে। অগ্নি ব্যোমভেদী শব্দে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া শত মূর্ত্তিতে উর্দ্ধগামী হইল, বালক সেই অগ্নিময় মূর্ত্তিরাশির দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেল যে হোম করিতেছে কেন? উদ্দীপ্ত হৃদয়ে সেই শত মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, প্রতিশোধ প্রতিশোধ! শত মূর্ত্তি যেন একত্রে তথাস্তু বলিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল।

(৩)

বালক মৃত, পিতা শোকোন্মত্ত, মাতার আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক, বিদারিত, কালীপ্রসাদের হৃদয় অনুতাপ-যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত ; সে ভাবিতেছে, পূর্ণহৃদয়ে সে দেবীর নিকট বালকের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে নাই সেইজন্যই এইরূপ ঘটিল !

চারিদিকের এই শোক বিষাদের মধ্যে বালিকা মেঘমালাব হাসিও বিলুপ্ত, কাঁদিতে কাঁদিতে একদিন সেও শয্যাশায়ী হইল।

বড় দুর্য্যোগ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, ঘন ঘন মেঘশব্দে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। কালীপ্রসাদ মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া করযোড়ে আকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে চমকিয়া মন্দিরসংলগ্ন অদূরস্থিত রুগ্নকক্ষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে।

একবার সহসা যেন আর্ত্তনাদী ক্রন্দন শুনিতে পাইল, সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, মন্দিরাধিপতি এই ঝড় বৃষ্টিতে গৃহত্যাগ করিয়া উন্মত্তবেশে ছুটিয়াছেন, কালী-প্রসাদ তীরবেগে নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "মেঘমালা !"

দেবীপ্রসন্ন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—

"ছাড়িয়া দাও, স্বপ্ন হইয়াছে।" যুবক দেখিল তিনি উন্মাদ, সবলে হাত ধরিয়া কহিল "কি স্বপ্ন ?"

তিনি আবার বলিলেন "ছাড়িয়া দাও, খুঁজিতে যাই।"

"কাহাকে ?"

"যাহাদিগের দুর্দ্দশা করিয়াছি।"

"কাহাদিগের ? কি দুর্দ্দশা করিয়াছেন ?"

"যাহারা এই মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী, মিথ্যা কৌশলে যাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাড়াইয়াছি, তাহাদিগকে খুঁজিতে যাই। হায় হায়! স্বামী স্ত্রীতে শিশু সন্তানটি লইয়া অসহায় নিঃসম্বল সেইরাত্রে কোথায় যে পালাইয়া গেল, আর দেখি নাই! ছাড়িয়া দাও"—

"এখন তাহাদিগকে কোথায় পাইবেন ?"

"হায় হায়! সেই পাপে আমার সমস্ত ছারখার। সব গিয়াছে, কেহ নাই, এক মাত্র মেঘা,—আমাকে ছাড়িয়া দাও খুঁজিয়া আনি"—

"তাঁহাদের কোথায় পাইবেন ? তাঁহারা ইহলোকে আর নাই।"

"না না আছে আছে; দেবীর আদেশ, তাহাকে—সেই শিশু সন্তানকে খুঁজিয়া আনিব, তাহার শাপ ঘুচিলে আমার মেঘা বাঁচিবে।"

সবলে হাত ছাড়াইয়া মন্দিরস্বামী ধাবমান্ হইলেন।

যুবক আবার তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতেই দেবীপ্রসন্ন থমকিয়া বলিলেন "তুমি কে ?"

উত্তর হইল "আমিই সেই শিশু, আর খুঁজিতে যাইবেন না।"

"তুমিই সেই! তোমার শাপে আমার সমস্ত ছারখার!" দেবীপ্রসন্ন মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বালক বিদীর্ণহৃদয়ে বলিল "দেবী রক্ষা কর, কি করিলে যাহা ছিল ফিরিবে? আমার জীবন গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব্ব প্রার্থনা বিফল কর।"

অদূরে আর্ত্তনাদ উঠিল, "মেঘমালা আর নাই!"

যুবক, ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্যুৎবেগে মন্দিরে কালীর সম্মুখীন্ হইয়া তাহার হস্তের শাণিত কৃপাণ সজোরে খুলিয়া লইয়া তাহাকে ছিন্নমস্তা করিয়া বলিল; "পাষাণি, রক্তপিপাসি, আজ হইতে পৃথিবীব প্রতিশোধ-স্পৃহা, তাহার রক্ত পিপাসা নিবৃত্ত হউক।" তাহার পর সেই শাণিত কৃপাণ আমুল নিজ বক্ষে সঞ্চালিত করিয়া বালক দেবীপদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

আত্মরক্তে তাহার প্রতিশোধ-বাসনা চরিতার্থ, নির্ব্বাপিত হইল।

যমুনা

(সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত)

(১)

শীতের প্রভাত, অন্ধকার কুয়াসার মাঝে মাঝে উষার আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে, উত্তরের হিম বাতাস বহিতেছে, কিন্তু আমাদের আজ ব্রাহ্মণভোজন—সকালেই ঘরের বাহির না হইলে নয়—আমি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যূষে উঠিয়া কলসীকক্ষে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম একটি গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া বসিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমরা মেয়েরা পরস্পরকে চিনি, দেখিলাম মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—একটু অবাক হইলাম, এমন রূপবতী যুবতী কন্যা একাকী এখানে কেন? তাহার শীতে বিবর্ণ, শ্রান্ত-ভাবাপন্ন মুখখানি দেখিয়া প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিল, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ গা তুমি কে গা, কোথা হইতে আসিয়াছ?" মেয়েটি বিষণ্ণ নেত্র তুলিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"আমি একজন যাত্রী গো, আর চলিতে পারিলাম না, এইখানেই তাই পড়িয়া আছি"—

"তুমি যুবতী একা যাত্রী! বাড়ীর লোকেরা তোমাকে এরূপে একা ছাড়িয়া দিয়াছে?"

যুবতী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"বাড়ীর লোক আমার কেহ নাই।" তাহার বিষণ্ণ স্বর আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—বলিলাম—"কেহ নাই! তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

যুবতী বলিল—"যদি স্থান পাই, এইখানেই থাকিব, আমাকে কেহ এখানে দাসী রাখিবেন?"

আমার চোখে জল আসিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও মুখ ফুটিল না—বুঝিলাম অভাগিনী বিধবা, সংসারের মোহাবর্ত্তে পড়িয়া আশ্রয় হারাইয়াছে, বলিলাম—"আজ হইতে আমি তোর দিদি হইলাম—আমার সঙ্গে আয়।"

গঙ্গাস্নান করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম।

(২)

অল্প দিনের মধ্যেই যমুনা আমাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িল, এমন কোন কথা নাই যাহা তাহাকে না বলিয়া আমাদের দুই যায়ের তৃপ্তি হয়, এমন কোন আমোদ প্রমোদ কাজ কর্ম্ম নাই যাহা তাহাকে ছাড়িয়া ভোগ

করিতে আমাদের মন উঠে। ক্রিয়া কর্ম্মে, অসুখে বিসুখে, হর্ষে উল্লাসে যমুনা আমাদের সঙ্গিনী, সুখে দুঃখে আমাদেব আপনার। কিন্তু আমরা তাহাকে যতদূর আপনার ভাবি সে কি আমাদের ততদূর ভাবে?

আমাদের স্নেহে তাহার ত সে স্থির বিষণ্ণ ভাব ঘুচে না, আমাদের কাছে সে ত কখনও তাহার হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলে না। এতদিন আসিয়াছে আমরা তাহার জীবন-ইতিহাস কিছুই জানিলাম না, এই মাত্র জানি—জাতিতে সে আমাদের এক জাতি, সে কায়স্থকন্যা। বাপের বাড়ী তাহার মেদিনীপুর জেলায়। বাপ মা এখন কেহই নাই, তাহার দাঁড়াইবারও স্থান নাই।

"কেন শ্বশুরালয়?"

এ কথার সে উত্তর করিতে চাহে না, এ সম্বন্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেই তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে—সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

আমাদের সহিত যমুনার এরূপ লুকাচুরী ভাব কেন? ইহা কি আমাদের প্রতি তাহার ভালবাসার অভাব? বুঝি তাহা নহে, আমাদের সুখে দুঃখে তাহার সে আন্তরিক মমতা মৌখিক হইতে পারে না। বুঝি বা তাহার জীবনে এরূপ লজ্জার কথা আছে—যাহা প্রকাশ করিতে তাহাব বুক ফাটিয়া যায়—যাহা প্রকাশ করিয়া কহিয়া কাহারও মমতা প্রত্যাশা করিতেও সে সাহসী নহে; এই ভাবিয়া

আমরাও আর তাহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি না; তবুও মনের মধ্যে একটা কৌতূহল আন্দোলিত হইতে থাকে। তাহার এখনকার নিঃস্বার্থ পবিত্র জীবন কখনও মলিন ভাবে ঢাকিয়া গিয়াছিল—ইহা সকল সময় মনে করিতেও পারি না, সময় সময় একেবারে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—তাই মাঝে মাঝে যমুনার এই লুকাচুরীতে, এই অবিশ্বাসের ভাবে বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়ি।

এখনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই, যমুনা শীতকালে আসিয়াছিল এখন বর্ষা আসিয়াছে। আজ সকাল হইতে মেঘ করিয়া আছে; চারিদিক একটা অন্ধকার বিষণ্ণ ভাবে আচ্ছন্ন,—আমরা দুই জনে বিকালে গঙ্গায় গা ধুইতে আসিয়াছি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে—আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া গঙ্গার জল যেন আরো কালো করিয়া তুলিল—আমরা জলে নামিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"যমুনা শীঘ্র ওঠ—আর না"—যমুনা আমার দিকে মুখ ফিরাইল,—চমকিয়া উঠিলাম—কি ঘোর বিষণ্ণতা! বাহিরের অন্ধকার যেন তাহার হৃদয়ের অর্দ্ধ বিকাশ মাত্র। আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দিদি তুমি ঘরে যাও—আমি আর একটু থাকি।" আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম "যমুনা আমরা কি তোর এতই পর?"

সে আমার কথা বুঝিল, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিল "দিদি আর ত আমার আপনার অন্য কেহ নাই!"

"তবে যমুনা তোর এই বিশ্বাসের অভাব কেন? আমাদের কাছে মনের কথা লুকাস্ কেন?"

যমুনা ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া কহিল "ভগবান জানেন কেন লুকাই? কিন্তু আজ আর লুকাইব না, যদি এই অভাগিনীর জীবন শুনিতে এতই সাধ, তবে শোন দিদি।"

আমরা সিঁড়িতে উঠিয়া বসিলাম, চৌদিকে অন্ধকার, পদতলে নদী, মাথার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, দুইজনে চারিদিক ভুলিয়া দুই জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, যমুনা গল্প কহিতে লাগিল, আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

(২)

"সে দিনও ঠিক এই রকম একটি দিন, সকাল হইতে মেঘ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আমি আমাদের কুটীরে আমার রুগ্ন মাতার কাছে বসিয়া আছি। আমার বয়স ১৪ বৎসর, কিন্তু তখনও বিবাহ হয় নাই। আমার বয়স যখন ৫ বৎসর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা ধনবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দু-এক জন দুষ্ট লোকে তাঁহার ঋণের দাবী দিয়া আমাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লয়। সংসারে

আমাদের এমন আপনার লোক কেহ নাই যে উদ্যোগ করিয়া, যত্ন করিয়া আমার বিবাহ দিয়া দেয়; মা একা স্ত্রীলোক—দরিদ্র কায়স্থকন্যার বিবাহ সহজে হয় না। তাই এতদিন আমার বিবাহ হয় নাই। মা সে জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মনের অসুখে শরীর অসুখ দিন দিন তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি যাহাকে নিকটে পান কেবল ঐ কথাই বলেন, একটি সুপাত্র স্থির করিতে অনুরোধ করেন, ঐ এক কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছে, তাহা ছাড়া যেন তাঁহার মনে আর কোন চিন্তাই নাই। সে দিন সন্ধ্যাবেলাও ঐ কথা হইতেছিল, মা গেলে আমার কি দশা হইবে আমাকে বুকে ধরিয়া মা তাহাই বলিতেছিলেন, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘরের মধ্যে আমাদের দু জনের অশ্রুধারা বহিতেছিল। এমন সময় আমাদের কুটীরের দ্বারে ঘা পড়িল। মা বলিলেন হারার মা এল বুঝি, দরজাটা খুলে দে।" হারার মা আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী, আমাদের ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। হারার মা নহে, একজন আর্দ্র-কলেবর অপরিচিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলিলেন "আমাকে আজিকার মত এখানে একটু আশ্রয় দিবেন কি? এই বৃষ্টিতে আর

চলিতে পারিতেছি না।" মা তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন 'আহা তা ভিজবে কেন বাছা, রাতটা এইখানেই থাকো।"

পথিক সে রাত্রির জন্য আমাদের অতিথি হইলেন।

আমাদের চার খানি ঘর। একটি রান্নাঘর একটি গোয়াল, আর দুইখানি ভাল ঘর, তাহারি একখানি পথিকের শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল, আমাদের যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম পথিক পীড়িত। সে দিনও তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। ক্রমে এক রাত্রির পরিবর্ত্তে এক সপ্তাহ, এক সপ্তাহের পর এক মাস প্রায় কাটিয়া গেল, পীড়িত পথিক আমাদের গৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।"

বলিতে বলিতে সহসা যমুনার বিষণ্ণ মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পাইল, বুঝি বা তাহা অন্ধকার জীবনে সুখস্মৃতির দীপ্তি। যমুনা একটুখানি থামিয়া সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "দিদি সেদিনের পর বাঁচিয়া রহিলাম কেন? প্রতিদিন অন্য কাজ কর্ম্মের মধ্যে ছুটিয়া যখন পথিককে দেখিতে আসিতাম, প্রতিদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহার মুখে আরোগ্য লাভের লাবণ্য সঞ্চার দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, সেই আনন্দ না হারাইতে হারাইতে মরিয়া গেলাম

না কেন ? প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার সতৃষ্ণ নয়নে যে নীরব ঔৎসুক্য দেখিতে পাইতাম, যে ঔৎসুক্যে কিছু না বুঝিয়াও মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার ভালবাসা অনুভব করিতাম, যে ভালবাসা তাঁহার দেবত্ব বিভাসিত করিত, সেই প্রেমে সেই দেবত্বে বিশ্বাস থাকিতে থাকিতে কেন মরিয়া গেলাম না ?"

যমুনা থামিল, একটা অসহ্য কষ্টে যেন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল, নদী উথলিতে লাগিল, আমরা দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

যমুনা আবার আরম্ভ করিল "পথিক আরোগ্য লাভ করিলেন, তাঁহার যাওয়ার আর কোন বাধা নাই, প্রতিদিন শুনিতেছি দুই চারি দিনের মধ্যেই যাইবেন কিন্তু সে দুই চার দিন আর ফুরাইতেছে না। এক দিন আমি অন্য ঘরে কাজ করিতেছি, পাশের ঘরে মা পথিকের সহিত গল্প করিতেছিলেন—হঠাৎ এই কথাগুলি কানে গেল,—"আমার কথাটা একটু বিবেচনা করিবেন, আপনাদের ন্যায় আমিও সদ্বংশজাত কায়স্থ, আমার অর্থ আছে, আপনার কন্যাকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—"

এই সময়ে আমার সই কুসুম আসিয়া আমাকে ডাকিল, আর কিছু শোনা হইল না, কি জানি কুসুম যদি

ঘরের মধ্যে আসিয়া সব শুনিয়া ফেলে—তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া কুসুমের কাছে আসিলাম।

সেই দিন কুসুমদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, পথিকের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত রাত সে দিন ঘুম হইল না, বিবাহ কি তখন ঠিক বুঝিতাম না, এইটুকু বুঝিলাম পথিক আমাদের ফেলিয়া আর চলিয়া যাইবেন না, পথিক আমাদের আপনার হইবেন। এই মিলনের আনন্দের মধ্যে কেমন একটা বিচ্ছেদের ভাব তাড়াইতে পারিলাম না, কে জানে কেন সুখে দুঃখে আকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। কিছু দিনের মধ্যে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। মা যেন আমাকে বিবাহিত দেখিবার জন্যই জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, বিবাহের অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল, স্বামীর প্রেম পাইয়া স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ হারাইলাম।

(৩)

আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব। স্বামী প্রথমে একাকী একবার বাড়ী যাইতে চাহেন, কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করাতে আমাকে একেবারেই সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

নববধূর স্বামীর গৃহে যাইতে কত না আহ্লাদ, শ্বাশুড়ি বধূ দেখিয়া কত না আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহার স্নেহে মাতার স্নেহ লাভ করিব, ছোট ছোট দেবর ও ননদেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইবে, আমার ভাই বোন নাই, তাহাদের ভাই বোন পাইব ; গুরুজনের আশীর্ব্বাদের মধ্যে, পরিজনবর্গের আনন্দের মধ্যে, প্রেমময় স্বামীর সহিত নূতন সংসারে প্রবেশ করিব, প্রাণে কত আহ্লাদ, মনে কত সুখের ছবি। সারাপথ পালকীর মধ্যে এই কথাই মনে জাগিতেছে, পাল্কী থামিলে স্বামীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পাল্কী নামিতেছে তখন হঠাৎ কেমন একটা ক্ষণস্থায়ী নিরাশার মধ্যে এতক্ষণকার আশা নিবিয়া পড়িতেছে ; স্বামীর মুখে যেন আমার হৃদয়ের আনন্দ প্রতিফলিত দেখিতেছি না—তাঁহাকে যেন এক একবার অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ আশায় নিরাশায় সুখে দুঃখে আট দিন পথে পথে কাটিল, পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম বিকালের মধ্যে বাড়ী পৌঁছিব, ঔৎসুক্যে মন পূর্ণ হইয়া রহিল। বিকালে গ্রামের নিকট পাল্কী থামিল। স্বামী সেইখান হইতে তাঁহার ও আমার দুইখানা পাল্কীই বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন বাড়ী অতি নিকটে, সন্ধ্যা হইলে দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া পৌঁছিব। নব বধূ বেড়াইতে বেড়াইতে গৃহে যাইবে কেমন নূতন

রকম বোধ হইল, বড় লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, দু একটা আপত্তির কথা কি বলিতে গেলাম, স্বামী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

শীতকালের বিকাল, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের আলো সন্ধ্যার আঁধার এক হইয়া আসে, অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিক একটা মলিন আলোকে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল। একটি নির্জ্জনপথে স্বামীর অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে একটা তরুলতাময় ক্ষুদ্র জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলাম, সহসা একটা অন্ধকার যেন বাহিরের আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, স্বামী বলিলেন, "ঐ দেখ আমাদের বাড়ী।"

কম্পিত হৃদয়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম; একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী নজরে পড়িল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামী বলিলেন—"তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি আসিতেছি।"

তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, অপরিচিত অন্ধকার স্থানে, একটা অজানিত অন্ধকার হৃদয়ে ধরিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে প্রদীপ হস্তে একটী রমণী আমার দিকে আগুয়ান হইলেন, ভাবিলাম এইবার শ্বাশুড়িঠাকরুণ আমাকে লইতে আসিয়াছেন, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া

দিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া বলিলেন—"এই বুঝি নূতন দাসী, তা দাসীর আবার এত ঘোমটা কেন" ?

কি শুনিলাম কিছু বুঝিলাম না—কেবল একটা বজ্রের ধ্বনি মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিয়া মর্ম্মভেদ করিয়া চলিয়া গেল—বাড়ী ঘর চৌদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

মানুষ যাহা চায় তাহা বুঝি পায় না, যাহা পায় তাহা বুঝি চায় না! আমি জ্ঞান চাহি নাই, তবু জ্ঞান জন্মিল, দেখিলাম একটি অপরিচিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মলিন শয্যার উপর একাকী পড়িয়া আছি। প্রাণ ছট ফট করিয়া উঠিল, আকুল হইয়া চৌদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যাহাকে দেখিতে কাতর তাহার দেখা পাইলাম না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাঁদিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কিছু পরে একজন স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিয়া বসিল, আমাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল,—জানিতে যাহা বাকী ছিল সব জানিলাম। সেই দিন হইতে তিন-চার দিন আমি পীড়িত। জানিলাম তাহার ন্যায় আমিও দাসী, তাহা ছাড়া অন্য অধিকার আমার নাই। স্বামী জাতিতে বৈদ্য আমি কায়স্থ তাঁহার সহিত আমার বিবাহ বিবাহই নহে। প্রথম রাত্রিতে যে রমণী আমাকে দাসী বলিয়াছিলেন—তিনি স্বামীর পরিণীতা পত্নী! সব শুনিলাম, সব বুঝিলাম, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা

ভোগ করিলাম, তবু মৃত্যু হইল না, তবু আরোগ্য লাভ করিলাম, ক্রমে উঠিবার হাঁটিবার সামর্থ্য জন্মিল, আমি চলিয়া যাইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

এক দিন দুপর বেলায় বাড়ীর সকলে যখন বিশ্রাম লাভ করিতেছে—আমি একাকী গৃহের বাহির হইয়া গেলাম জঙ্গল পার হইয়া মুক্ত মাঠে আসিয়া পড়িয়া একটি আম-গাছের তলায় বসিলাম, তখনও অধিক পথ চলিবার বল নাই; চারিদিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে দূর তরুমধ্য হইতে ঘুঘু ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিয়া বহিয়া আবার থামিয়া পড়িতেছে, আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি তাহাতেই হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—আমার চারিদিক কি শূন্য! কি অন্ধকার! আমার আর কেহ নাই, কিছু নাই, এই অসীম সংসারে আমি একাকী! ওগো পৃথিবীতে আর কেহ কাহাকে কি বিশ্বাস করিবে না—ভাল বাসিবে না! পৃথিবীতে কি সকলেই এইরূপ প্রতারক। সকল পুরুষেই কি এইরূপ বিশ্বস্তহৃদয়া বালিকাকে প্রতারণা করিয়া, তাহার জীবন কলঙ্কিত করিয়াই সুখ অনুভব করে? সংসারের কি এই নিয়ম!

অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইলাম! সেই রাতের পর এই প্রথম দেখা, সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। এই কি সেই? করুণাময় স্বামী ভাবিয়া যাহার পদতলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন

দিয়াছি—এই কি সেই ? দেবতা ভাবিয়া যাহাকে দিবানিশি পূজা করিয়াছি—সেই দেবতা আমার আজ প্রতারক! সেই করুণাময় স্বামী আজ আমার প্রাণহন্তারক।

স্বামী আমার নিকটে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন "যমুনা আমাকে মাপ কর, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব। তোমাকে এখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার সহিত দেখা করিবারও একবার সুবিধা হয় নাই।"

সর্ব্বাঙ্গে হুহু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, এইখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছেন—আর কিছু অন্যায় নহে। স্বামী আমার স্কন্ধে হাত দিতে যাইতেছিলেন, বিদ্যুতের মত সরিয়া দাঁড়াইয়া গর্ব্বিত তীব্র স্বরে বলিলাম "আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্শ করিও না।" স্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আমি রুদ্ধ শ্বাসে সেথান হইতে চলিয়া গেলাম, কিন্তু স্বামী আমার অনুসরণ করেন নাই।

তাহার পর এইখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

---

(৪)

যমুনার কথা শেষ হইয়াছে, বৃষ্টিও প্রায় থামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মত আকাশ এখনো মেঘান্ধ, মেঘান্ধ হৃদয়ে সেই মেঘান্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া

আমরা দুজনে নিস্তব্ধে বসিয়া আছি, এই সময় ওপাড়ার কালিন্দি কলসীকক্ষে ঘাটে আসিল—আমাদের দেখিয়া বলিল—"কি লো তোরা দুজনে চুপ চাপ করে ভাবছিস্ কি? আমি তখন উঠিলাম, যমুনাকে বলিলাম "ঘরে আয়"।

দুজনে নদী তীর হইতে দুই এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় আমাদের ঝি আসিয়া বলিল—"মাঠাকরুণ যমুনা দিদির দেশের একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়"।

"যমুনার দেশের লোক?" যমুনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমরা গৃহাভিমুখী হইলাম, বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দাসী অদূরের একটী বৃক্ষতলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—যমুনার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, সে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল।—বৃক্ষতল হইতে একজন পুরুষ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমি সরিয়া গেলাম—পুরুষ যমুনার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—ছিন্নশাখার ন্যায় সহসা যমুনা তাহার পদতলে পড়িয়া গেল।

সে পুরুষ আর কেহ নহে যমুনার স্বামী। যমুনার সন্ধান পাইয়া তিনি তাহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। যমুনার রূপের ঘোর এখনো বুঝি তাঁহার হৃদয়ে কিছু লাগিয়াছিল। যমুনা প্রথমে তাঁহার সহিত যাইতে কোন মতে সম্মত হইল না,—কিন্তু তাহার স্বামী মহা জেদ ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন যে, যমুনা তাহার সঙ্গে না গেলে তিনিও

ফিরিবেন না; দুই চার দিন চলিয়া গেল—সত্যই তিনি এইখানে রহিয়া গেলেন—তখন সে যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু যাইবার আগে স্বামীকে অঙ্গীকার করাইয়া লইল যে, তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিবেন—এবং তাহাকে পরস্ত্রী ভাবে দেখিবেন।

(৫)

যমুনা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না,—যেখানে সেখানে তাহার স্মৃতি ছড়ান, সুখে দুঃখে আমাদের সে সঙ্গিনী ছিল, সুখে দুঃখে তাহাকে মনে পড়িয়া যায়। আমার ছোট ছেলেটীর কয়দিন হইতে অসুখ করিয়াছে, নিকটে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে করিতে ক্রমাগত যমুনার কথাই মনে পড়িতেছে, সে গোপালকে বড় ভাল বাসিত তাহার কোলে-কোলেই গোপাল মানুষ হইয়াছে—যমুনা এখন এখানে থাকিলে কত যত্নই ইহাকে করিত! হঠাৎ এ চিন্তায় বাধা পড়িল—খোকার দাসী বলিল—

"মা খোকার অসুখ ত এখনো সারছে না,—তা শুনছি শ্মশানে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে, অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে—তার কাছে একবার গেলে হয় না?"—

কথাটা মনে লাগিল, সেই বিকালেই তাহার সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর নিকট গমন করিলাম।

নদীতীরে শ্মশানে শবকুটীর, সে কুটীরে শ্মশান হইতে বিষণ্ণগম্ভীর এলোকেশী মূর্ত্তি! হৃদয় স্তম্ভিত হইল—ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হইতে গেলাম—কিন্তু ভূমিষ্ঠ না হইতে হইতে সন্ন্যাসিনী হাত ধরিয়া উঠাইলেন—অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিলাম—সেই রুক্ষজটাযুক্ত, কেশপাশ-প্রচ্ছন্ন, মলিন গম্ভীর অপরিচিত মুখ কাহাকে মনে করাইয়া দিতেছে? অথচ তাহাকে ত এখানে দেখিবার কোন সম্ভাবনাই নাই! আমার সে আকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর অধর প্রান্তে হাসির রেখা পড়িল—আমি বলিয়া উঠিলাম "যমুনা!" যমুনার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, আবার তাহাব মুখের দিকে চাহিলাম, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল—বলিলাম "যমুনা তোর এ কি বেশ!" যমুনার নেত্র অশ্রুহীন, সে কোন উত্তর করিল না—একটু কেবল হাসিল। অত দুঃখে লোকে হাসিতে পারে! আশ্চর্য্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম —"যমুনা আবার ফিরিয়া আসিলি কেন"? যমুনা বলিল "দিদি ভাঙ্গা জিনিস কি যোড়া লাগে? শুনিলাম অন্যের নিকট স্বামী আমাকে "—" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন—তাই চলিয়া আসিয়াছি"।

কথা গুলি সে হাসিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—সে হাসিতে মর্ম্ম বিদ্ধ হইল, বুঝিলাম সে কি কষ্টের হাসি, বুঝিলাম অশ্রুতে সে কষ্টের সান্ত্বনা নাই, তাই এ হাসির উপেক্ষা। যমুনা বুঝি আমার কষ্ট বুঝিল, বলিল—"দিদি মানুষের জন্য মানুষের কি কষ্ট হয়!—মিথ্যা কথা—সব কষ্ট আপনার জন্য"।—আর কথা কহিলাম না,—স্তব্ধ হইয়া গেলাম, বুঝিলাম যমুনা সে যমুনা নহে।

কিছু পরে আমি বলিলাম "যমুনা আমাদের বাড়ী চল না"?

যমুনা উত্তর করিল "দিদি শ্মশানই আমার আপনার ঘর, এ ঘর আর ছাড়িব না"।

অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহাকে বাড়ী আনিতে পারিলাম না, তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া জীবন্তে সে শ্মশানবাসী হইল। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতাম, একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কুটীরদ্বারে আসিতেই কতকগুলা শৃগাল কুক্কুর আমার দিকে চাহিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল, হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—অভাগিনীর মৃত দেহ ভূমিতে লুটাইতেছে, শিহরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কেন ?

সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ ? কোলে সোনার পুত্তলি বৎস, কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ির কন্যার অধিক স্নেহ যত্ন,--তবুও মনের আগুন নেবে না। মা ত ছেলের দেখা পাইলেই বৌয়ের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝান, ইনাইয়া বিনাইয়া আমার প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেক করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন না, আবার সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিতেও ছাড়েন না। কিন্তু ইহাতে যে বড় সুফল দর্শে তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। এমনিতে তবু দিনান্তে একবার করিয়া প্রায় বাড়ী আসেন, কিন্তু শ্বাশুড়ি বকাবকি করিলে দুচার দিন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। স্বামী যে ভালবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও সয় কিন্তু তাঁহার এই অদর্শন সহে না, নিয়মিত সময়ে তাঁহার যে দিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মনে হয় স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ। নেশা গো নেশা! সময়ে অহিফেন বা সুরা না পাইলে নেশাখোরের যে দুর্দ্দশা— ইহাও সেইরূপ! সমস্ত বুঝি, তবু এ নেশা তাড়াইতে

পারি না। কাজেই শ্বাশুড়ির শুভ উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ না দিয়া মনে মনে তাঁহার অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করি।

দিন পনর হইল এবার 'উনি' বাড়ী আসেন নাই। 'সেখানে' লোকের উপর লোক যায়, ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'বাড়ী বন্ধ গো, বাবু বাগানে গেছেন। শ্বাশুড়ি ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির, আর আমার আহার নিদ্রা ত একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। খোকার মুখের দিকে চাইয়া আর ভগবানকে প্রাণ মনে ডাকিয়া কোন রকমে দিনটা কাটিয়া যায় মাত্র। একদিন সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ রাতে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—স্বপ্নে দেখিলাম, আকাশ ফাটিয়া চারিদিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, সেই জ্যোতির মধ্যে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা এক দেবীরূপা রমণী আমাকে একটি জবাফুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নে মাথায় পর, স্বামী ভাল বাসিবে।" আমি ফুলটি ধরিলাম। অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিলাম তখনও ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই, তাড়াতাড়ি উঠিয়া শ্বাশুড়িকে জাগাইয়া আমার স্বপ্নটি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন 'জবাটি পাইয়াছ কি? আমি বলিলাম 'না'। তিনি বলিলেন—

"তবে বাছা কালীঘাট যাও, কালী তোমাকে ঐ অপরূপ বেশে দেখা দিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার ফুল পরিয়া এস।"

২

আমাদের বাড়ী ভবানীপুরে, কালীঘাট নিকটেই। আগেও অনেকবার কালীঘাটে আসিয়াছি, দেবীদর্শন করিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইয়াছি; কিন্তু আজ প্রাতঃকালে তাঁহার দ্বারে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, বলিরক্ত-স্রোতের পার্শ্ব দিয়া লোল-জিহ্বা, কৃপাণ-হস্তা, নৃমুণ্ডধারিণী, ভীমরূপা কালীর সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন যেন মাথা ঘুরিয়া উঠিল। স্বপ্নের সেই করুণারূপিণী, সুপ্রসন্না, হাস্যময়ী, অনুপমা, অপরূপা, প্রাণমোহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত ইঁহাকে এক ভাবিতে পারিলাম না। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ আশাযুক্ত সুশীতল হইয়া উঠিয়াছিল, ইঁহাকে দেখিয়া ভয়-শিহরিত, নিরাশ-কম্পিত হইয়া দ্বারদেশেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে উমি দাসী ছিল, সে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল "ওমা বৌমার আমাদের এ কি হলো গো।" সেখানকার একজন পূজারী ব্রাহ্মণ—তিনি আমাদের চিনিতেন,—তিনি তাড়াতাড়ি কালীর কোষাকুষি হইতে খানিকটা জল আমার মাথায় দিয়া উমিকে বলিলেন, "এখানে লোকজন আসছে বৌমাকে ধরে ঐ গাছতলায় নিয়ে গিয়ে বসাও।" আমি উমিকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে একটি নির্জ্জন গাছতলায় আসিয়া বসিলাম। গাছতলায় আর একজন রমণী বসিয়াছিল—উমি তাহার সহিত গল্প ফাঁদিয়া বসিল।

বলিল—"বৌঠাকরুণকে নিয়ে আথান্তরে পড়েছিলুম ভিরমি গো ভিরমি, হ্যাঁগা তুমি কোথায় থাক গা ?"

রমণী উত্তর করিল—"আমি অনেক দূরে থাকি গো, আমায় চিনবে না, তোমরা কোথা থেকে আসছ গা ?"

দাসী। আমরা এই ভবানীপুরেরই লোক, প্রাণনাথ বাবুর নাম শুনে থাকবে কি ? এককালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—

রমণী। উনি তাঁর কে হন ?

দাসী। স্ত্রী গো স্ত্রী। তা বলব কি দুঃখের কথা! ত্যজ্যা হলেন কমলিনী, কুব্জা এখন পাটরাণী। একবার মুখপানে চেয়েও দেখেনা গো, মনোদুঃখে শরীরটা পাত করছে! একবার বেটীকে পাই ত দেখিয়ে দিই। ডাইনি বেটী!—একটু মায়া দয়া নেই। এমন লক্ষ্মীর এই দশা করলি। শুনতে পাই নাকি গেরস্থ ঘরের মেয়ে ছিল; পোড়া কপাল অমন—

আমি তখন ভাল হইয়া উঠিয়াছি, বলিলাম—"উমি, তাকে গাল দিস্ কেন ? আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেন নি তার কি দোষ!"

ইহার পর অপরিচিতা নিকটে আসিয়া বলিল—"সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন স্ত্রীকে স্বামী নেয় না।"

দাসী বলিল—"শুধু নেয় না! দেখ না গায়ে একখানি গহনা পর্য্যন্ত রাখেনি। এদিকে ত বাবু বাড়ী থাকেন না,

কেবল যখন গহনার দরকার হয়, তখন রাতবাস করতে আসেন। আমরা কত করে বলি, বৌমা দিওনা গো, স্বামী গেছে যাক্, গহনাগুলোও যাবে,—দিও না।—তা যখন ছুটো মিষ্টি কথা বলে বাবু বিপদ জানায়—তখন ওর কি আর বুদ্ধি সুদ্ধি থাকে? মা সে দিন গহনার জন্য বাবুকে এমন ত গঞ্জনা দেয় নি, সেই অবধি আর বাবুর দেখা নাই। আর দেখ না, বৌমা ভেবে ভেবে খুন হচ্ছে!”

আমি বলিলাম—“কি বকিস্ উর্মি, চুপ কর।”

রমণী বলিল—“তা ত সত্যি কথা। আমরা হলে অমন স্বামীর মুখ দেখিনে। দিদি, তোমার ভাল হবে, এমন লোকের দুঃখ চিরকাল থাকে না।” রমণীর নয়নে করুণাজ্যোতি বিভাসিত হইল, সে আমার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বিকম্পিত স্বরে বলিল, “এ পুণ্যবতীকে যে আদর করিতে জানে না, তাহার নিতান্তই দুর্ভাগ্য। দিদি, তোর দুঃখ আমাকে দে; মা কালী যেন তোকে সুখী করেন।”

তাহার সমস্ত মুর্ত্তিতে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইল, আমার স্বপ্নের দেবীকে মনে পড়িল!

৩

সে দিন তুপর বেলা একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা আসিয়া হাঁকিল—"গো মাঠাকরুণরা, এই গহনা নেও গো, বাবু আমার ঠাঁই বাঁধা রেখেছিল, টাকা দিয়ে বল্লে বাড়ী দিয়ে এস, বুঝে সুঝে সব নেও।"

মা (শ্বাশুড়ি) ত আহ্লাদে নির্ব্বাক! উমি বলিল, "মা কালী বাবুর এই সুমতি দিয়েছে, বৌমা এদিকে এসগো"—

মা গহনাগুলি দেখিয়া শুনিয়া লইতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে টাকা দিয়েছেন ?" জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, কবে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে; আর এক জন তাঁহাকে দেখিয়াছে শুনিলেও মনটা কিছু ঠাণ্ডা হয়।

বৃদ্ধা বলিল, "এই আজকেরি—মরুগ্‌গে! এই কদিন হোল দিয়েছে, তা কাজে কর্ম্মে আসতে পারিনি।"

মা বলিলেন—"ছেলে কবে বাড়ী আসবে তা কি কিছু জান ?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিল—"তা বাছা কি করে জানব? এখন ত গহনা পেলে, অমি চল্লু।" আমার ইচ্ছা করিতেছিল বৃদ্ধাকে বসাইয়া ভাল করিয়া তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইল না, বৃদ্ধা এমনি হঠাৎ চলিয়া গেল!

সেইদিন সন্ধ্যা বেলা স্বামীও বাড়ী আসিলেন, বাড়ীর সকলেরই মহানন্দ! মা তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া বলিলেন, বাছা গহনা সব পেয়েছি কিন্তু বিধাতা তোর সুমতি দিয়েছেন তাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!"

স্বামী আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি গহনা!"

মা। কেন বৌয়ের গহনা! যাকে বাঁধা দিয়েছিলি সেই বুড়ী মাগী আজ দিয়ে গেল, বল্লে তুই টাকা দিয়েছিস।

স্বামী একটু খানি দম লইয়া বলিলেন—"ওঃ"!

আহারান্তে তিনি ঘরে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"গহনা দিয়ে গেছে? কই দেখি?"

আমি তাঁহাকে আনিয়া দিলাম, তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ আজ পূর্ব্ব হইতেই বিষণ্ণ; গহনাগুলি দেখিবার পর আরো ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া গেল, আমি বলিলাম, "তোমার কি গহনার আর দরকার আছে? থাকে ত নাওনা।"

স্বামী কষ্টের স্বরে বলিলেন—"না।"

কিছু পরে তিনি অন্য দিনের মত চলিয়া গেলেন, আমি তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বহু

রাত্রি এমন গভীর নিদ্রা হয় নাই। সকাল বেলা খোকা উঠিয়া "বা—বা" করিয়া হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া মনে করিলাম এ কি! এখনও কি স্বপ্ন দেখিতেছি! বিস্ময়ে চক্ষুমর্দ্দন করিয়া আবার চাহিলাম, দেখিলাম স্বপ্ন নহে, সত্যই স্বামী পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন, তাঁহার মুখ বিষাদগম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহাবিপ্লব। আমি চমকিয়া বলিলাম—"তুমি! কি হইয়াছে তোমার?" স্বামী কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলেন, খোকা—"বা—বা" করিয়া হাসিয়া উঠিল, তিনি তাহাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন, তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি কাতর হইয়া বলিলাম "স্বামী, প্রভু, সর্ব্বস্ব, তোমার কি হইয়াছে? আমাকে খুলিয়া বল, আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব"।

স্বামী খোকাকে বিছানায় রাখিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার আর চাহিবার কিছু নাই। তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে?"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভরিয়া গেল, আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ জীবনে কখনও পাই নাই, পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই দিন তাহা আমি জানিয়াছিলাম।

* * * *

সেই দিন হইতে স্বামী একেবারে পরিবর্ত্তিত, স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি এখন গৃহবাসী। কিন্তু সহসা এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এ কৌতূহল আমার এখনও মিটিল না। স্বামী এ কথার উত্তর দিতে চাহেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়—তিনি কষ্টের স্বরে বলিয়াছিলেন "আমার এই অনুরোধটি রাখিও—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" সেই অবধি তাঁহার কাছে আর এ কথা তুলি না, আপন মনে সদা সর্ব্বদা এই প্রশ্ন করি—"কেন?" কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটা স্থির মীমাংসাতে আসিতে পারি নাই, তাই আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বলিতে পার—কেন?

আমার জীবন

(১)

তোমরা শুনিলেই আর একরকম ভাবিয়া বসিবে, কিন্তু আমি বেশ জানি সে সব কিছু নয়। দু একবার আমারও সন্দেহ হইয়াছে বটে ;—কিন্তু তখনই বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহা ভুল। একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়! তবে যে মৃণালিনী দেবীকে দেখিতে আমার ভাল লাগে—তাঁহার সহিত গল্প করিতে আনন্দ বোধ হয়, ইহার সহজ কারণ তাঁহাকে আমি ভালবাসি কিন্তু নিতান্ত সাদাসিধে বন্ধুতার ভালবাসা মাত্র, অন্য কিছু নহে, হইতেই পারে না,—একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়!

কখনকখনও তাঁহার স্বরে, তাঁহার হাসিতে, নয়নের দৃষ্টিতে, হাতের স্পর্শে আমার কেমন একটা মোহময় বিহ্বলতা জন্মে সত্য, কিন্তু নিশ্চয় জানি তাহার কারণ অন্য কিছু নহে ; তাহা পুরাতন স্মৃতির আকস্মিক উদ্রেক মাত্র। কে জানে কেন, থাকিয়া থাকিয়া, এই নয়নের তারায় আমি যেন সেই নয়নের জ্যোতি দেখিতে পাই, এই স্পর্শে সেই স্পর্শ অনুভব করি, এই

কণ্ঠে সেই কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাই,—তাই তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া, তাঁহার হাত হাতে ধরিয়া সময়ে সময়ে আমার এই তন্ময় ভাব, এই বিভ্রম, এই মোহ। এইখানে বলা আবশ্যক, আমি ডাক্তার, চিকিৎসা করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয়।

তুমি যে সুন্দরি হাসিয়া বলিতেছ—"হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার মত সকল পুরুষেরই এইরূপ মতিভ্রম ঘটে! মুড়ি খাইতে কোন কালেই তোমাদের ক্রুটি নাই, কেবল সুবিধা বুঝিয়া—তাহা মুড়ি কি চাল ভাজা এইটা বুঝিতেই ভুলিয়া যাও।"

এ কথায় আমি নাচার! কিন্তু তুমি মহাশয়া যাই বল, আমার বিশ্বাস আমি মুড়ি ও চালভাজার প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝি,—আর বুঝিয়াই বলিতেছি, ইহা প্রেম নহে, বন্ধুতা মাত্র। সুকোমল, সুদৃঢ় বহুপুণ্যজ, পরমুপাদেয় বন্ধুতা—তবে স্ত্রী পুরুষেই এরূপ বন্ধুতা সম্ভবে; পুরুষে পুরুষে ঠিক এরূপ বন্ধুতা হয় না। অশ্রুজলের প্রত্যাশায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন, মমতার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের দুঃখময় দ্বার এমন কি জীবনের ঘৃণিত অংশও অসঙ্কোচে উদ্‌ঘাটন—ইহা পুরুষের মধ্যে হাস্যকর, স্ত্রী পুরুষের বন্ধুতাতেই স্বাভাবিক।

না বলিয়া কি থাকা যায়? আর যদি কেহ পারে আমি ত না। সন্ধ্যাকালে অস্পষ্ট আলোকময় নির্জ্জন গৃহে আমার মুখের দিকে চাইয়া চাইয়া সে যখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ন স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি

ভাবিতেছেন? আপনার মুখে সর্ব্বদাই যেন একটি কষ্টের ছায়া দেখিতে পাই, মনে হয় আপনার প্রাণের ভিতর যেন কি একটি গভীর দুঃখ জাগিতেছে।" তখন কি আর আমি আত্ম-সংবরণ করিতে পারি? আমি বলিলাম—"তেমন দুঃখ যেন ভগবান কাহারও জীবনে না লেখেন।" বলিতে বলিতে আমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই অশ্রুবাষ্পের মধ্যে ছায়ার মত প্রতিবিম্বিত ক্ষীণ মূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কেবল যদি সেই প্রফুল্ল নবীন ভাবটুকু থাকিত! এই বিষণ্ণ নয়নের মধ্য দিয়া কেবল যদি সেই সরস সহাস ভাবটুকু ফুটিয়া বাহির হইত! এই ক্ষীণ কায়া, ক্ষীণ কপোল যদি আর একটু সুগোল, সুঠাম, পরিপুষ্ট এবং শৈশবকান্তিযুক্ত হইত! তাহা হইলে কি আমি মনে করিতে পারিতাম না, এ মূর্ত্তি তাহারই মূর্ত্তি—তাহার অনুরূপ নহে!"

যুবতীর দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার চিন্তাভঙ্গ হইল,—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার কথায় আপনাকে কষ্ট দিলাম বুঝি?"

যুবতী কোন কথা কহিল না;—সেই ক্ষীণালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল যেন তাহার নয়ন সজল। আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম—"কি হইয়াছে?"

মৃণালিনী নিরুত্তর।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইয়াছে ? আপনার অসুখ করিতেছে না ত ?"

যুবতী ধীরে ধীরে বলিল—"মনে করিতাম আপনি আমাকে নিতান্তই পর ভাবেন না—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এই ! তা এখন ভুল ভাঙ্গিল কিসে ?"

যুবতী বলিল—"আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না !"

"বিশ্বাস করিতে পারি না ! আপনার মত আমার বিশ্বাসী বন্ধু জগতে আর কে আছে।"

"তাহা হইলে আপনার দুঃখের ভাগ আমাকে দিতেন !"

আমি কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলাম—"ভগিনি ! যদি কাহারো নিকট আমি মনের কথা বলিতে পারি, জীবন খুলিয়া দেখাইতে পারি তবে সে তোমারি নিকট ! —তুমি অন্যায় অবিশ্বাস করিতেছ। তবে যে বলি না তাহার কারণ—আমার এই কষ্টকর জীবনকাহিনী বলিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না।" মনের আবেগে সহসা এবং এই প্রথম তাঁহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন !

মৃণালিনী বলিল—"সে কি কেবলি কষ্ট ! বন্ধুর অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুখে কি সে কষ্টও উপভোগ্য নহে ? জীবনে বিশ্বাসের মত সুখ কি কিছু আছে ?"

"তাহা সত্য। ভগিনি, তোমরা হৃদয় দিয়া দেখ, তোমরা দিব্য দর্শক। আমরা বুদ্ধির ঘোর প্যাঁচ করিতে গিয়া কেবল সন্দেহের ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াই। যদি বিশ্বাস করিয়া এ জীবন একদিন খুলিয়া দেখাইতে পারিতাম,—ত হয়ত এ কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিতাম। শোন ভগিনি, তুমিই শোন; যে ঘৃণ্য কথা তাহার নিকট লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারি নাই, তোমার নিকট বলিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি,—যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত থাকে! শুনিয়া জান এই নরাধম তোমার স্নেহের কিরূপ অযোগ্য; কিন্তু কিরূপ প্রাণমনে তোমাকে বিশ্বাস করিতেছে!

(২)

আমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া দেশে গিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত দেখা শুনা শেষ করিয়া আবার কলিকাতায় আসিয়াছি, কর্ম্মস্থলে যাইবার এখনো যে কয়দিন বিলম্ব আছে সেই কয়দিনের জন্য প্রাণকৃষ্ণ বাবুর অতিথি হইয়া আছি। প্রাণকৃষ্ণ বাবু আমার স্বদেশী, স্বজাতি—কেবল তাহাই নহে, আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বহুকালের বন্ধুত্ব চলিয়া আসিতেছে। ইনি এখন কলিকাতাতেই

বাস করেন, কলিকাতার একজন বড় উকীল; পয়সা কড়ি বেশ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার ধন ভোগ করিতে আর কেহই নাই, একমাত্র কন্যাই তাঁহার গৃহসর্ব্বস্ব,—গৃহিণী অল্পদিন হইল স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু যদিও বিলাত যান নাই কিন্তু তিনি ইংরাজী মেজাজের লোক, ইংরাজী চালেই চলেন। ইংরাজী পাড়ায় বাড়ী, ইংরাজী কেতায় থাকেন, মেয়েকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দেন নাই।

আমি আসিয়া শুনিলাম কিছুদিন হইতে মায়াবিনী পীড়িত। পীড়া অদ্ভুত! নূতন ধরণের হিষ্টিরিয়া, পীড়ার সময় বলপ্রকাশ কি অন্য কোনরূপ উপদ্রব নাই কেবল একবার অজ্ঞান হইলে ২৪ ঘণ্টা কাল রোগীর আর চেতনা থাকে না। তাহাকে তখন দেখিলে মনে হয় সে গভীর নিদ্রামগ্ন, অথচ পরে শুনিতে পাওয়া যায়, সে অবস্থাতেও ভিতরে ভিতরে তাহার জ্ঞান থাকে, তাহার নিকট কেহ কথা কহিলে সে শুনিতে পায়, স্পর্শ অনুভব করিতে পারে, কেবল নয়ন মুদ্রিত থাকায় সে কাহাকেও দেখিতে পায় না। ২৪ ঘণ্টার পর তাহার অল্পে অল্পে জ্ঞান জন্মে, কিন্তু ইহার তিন চারদিন পরে তবে সে সবল হইয়া উঠে।

পীড়ার আর এক অপূর্ব্ব লক্ষণ তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ

কিছুই বুঝা যায় না। কি কারণে তাহার আবির্ভাব তাহা রোগী নিজেই বলিতে পারে না বা বলে না ; আমার যদিচ শেষ কথাই ঠিক বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

আমি যখন তাহাকে প্রথম দেখিলাম তখন সে শয্যাগত।

তিন চারিদিন পূর্ব্বে মায়ার একবার মূর্চ্ছা হইয়া গিয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ বাবু যখন বলিলেন "চল মায়াকে দেখিবে চল, দেখ দেখি তুমি যদি রোগের কোন কারণ বাহির করিতে পার।" তখন আলুথালুকুন্তল, অসজ্জিত বেশ, চঞ্চলনয়ন, চঞ্চলচরণ, মধুর-চঞ্চল-ভাষী, কৃশকায় ছোট একটি বালিকাকে আমার মনে পড়িল। ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বিলাতে যাই, তখন মায়া ১২ বৎসরের বালিকা মাত্র। আমি তাহাকেই দেখিব প্রত্যাশা করিয়া জগৎবাবুর সঙ্গে সঙ্গে মায়ার শয়নকক্ষে পদার্পণ করিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। গৃহে একখানি কৌচে একজন যুবতী অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত ; সুললিত বেশ-বিন্যাস, শুভ্র পরিচ্ছদের চমৎকার পারিপাট্য, কপালে কুঞ্চিত অলক, শিথিল কবরী সুঠাম গ্রীবার শোভা সম্পাদন করিতেছে ; সহাস অধর, সরল দৃষ্টি; প্রফুল্ল অসঙ্কোচ ঢল ঢল ভাব, শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে অতি মধুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ—আমি দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ইনি রোগী নাকি ? রোগের চিহ্নের মধ্যে ইঁহার মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ-পাংশুবর্ণে আরও সুকোমল

শোভাময়! আমি দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া দেখিলাম সুন্দরীর হাতে একটি সুন্দর গোলাপ; ফুলটি সে আঘ্রাণ করিতেছিল আমাকে দেখিয়া হাত নীচু করিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আপনার ত কই কিছুই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না, তেমনিই ত আছেন, কেবল সাজসজ্জা কিছু বদল হইয়াছে মাত্র।"

কথার ক্ষীণ স্বরে তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য আরও যেন সহসা বর্দ্ধিত হইল। আমি কি উত্তর করিব ভাবিয়া পাইলাম না, আমার চক্ষে সমস্ত পরিবর্ত্তন! একি সত্যই মায়া! না আমি একটা মহা মায়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! প্রাণকৃষ্ণ বাবু একখানি চৌকি টানিয়া কৌচের নিকটে রাখিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন, আমি নিস্তব্ধে বসিলাম; তিনি জানালার নিকটে একখানি চৌকিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

বুঝিলাম আমি নিতান্ত জানোয়ার বনিতেছি, কোন একটা কথা কহা নিতান্তই আবশ্যক—ভাবিয়া বলিলাম "আপনি এখনও নিতান্ত দুর্ব্বল আছেন মনে হইতেছে?"

সে হাসিয়া বলিল "ইহার মধ্যে 'আপনি' হইয়া পড়িয়াছি! বিলাতের গুণ ধরিয়াছে বই কি!"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "তোমাকে কতটুকু দেখিয়া গিয়াছিলাম! ভুলিয়া যাইতে হয় যে তুমিই সেই!"

"কই আমিত ভুলি নাই—ভোলাটা দেখিতেছি পুরুষেরি ধর্ম্ম!"

কথাটা মায়া নিতান্ত আস্তে আস্তে বলিল, প্রাণকৃষ্ণ বাবু যাহাতে না শুনিতে পান। স্বাভাবিক স্বরে বলিলেও যে তিনি শুনিতে পাইতেন তাহাও নহে, এমনি একাগ্র-চিত্তে তিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

কথাটা আমার বুকে একটু বিঁধিল, তাই কিছু লাগিল ভাল! আমি বলিলাম "মায়া! তুমি এখনো তেমনি দুষ্টু আছ, কথায় তোমাকে পারা ভার," তবে এখন তোমার দুষ্টুমিটা আরও কিছু বাড়িয়াছে। আমি যে তোমাকে ভুলি নাই, চিনিতে না পারাই ত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।"

মায়া বলিল—"শুনিয়া সুখী হইলাম—এখন আপনার বিলাতের গল্প করুন।"

"সে পরে—আগে তোমার ব্যারামের কথাটা শুনি শুনিলাম যখন অজ্ঞান হও তাহার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও বুঝিতে পার না যে তখনি অজ্ঞান হইবে?"

"না।"

"কি কারণে যে ব্যামটা আক্রমণ করে তাহাও বুঝিতে পার না? আহারের অনিয়মে, কিম্বা বেশী কথা-বার্ত্তা কহিলে, কিম্বা বেশী পড়া শুনা করিলে, কিম্বা অন্য কোনরূপ চিন্তায়—"

মায়া আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "আপনি ডাক্তার মানুষ, সে সব আপনি আবিষ্কার করুন্; অত কিসে কি হয় বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই। ওসব বৃথা প্রশ্ন না করিয়া আপনার গল্প করুন্, তাতে আমি কিছু থাকিব ভাল।"

তাহার কথায় আমার মনে হইল—এ কথা সে এড়াইতে চায়, ভাবিলাম ক্রমে বাহির করিব, এখন তবে থাক। বলিলাম—"বিলাতের কথা! সে দেশ নন্দন ভুবন," একবার সেখানে গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না।"

"তবু ফির্‌তে হ'ল'—কি মনস্তাপ! বোধ করি আধ খানা রাখিয়া আসিয়াছেন!"

"আধ খানা কেন সম্পূর্ণ রাখিয়া আসিতেও আমার আপত্তি ছিল না—তবে কি জান, এ বোঝা যে কেহ বহিতে চাহে না!"

এতক্ষণ আমি এক টানা এক নিশ্বাসে আমার জীবনের কথা বলিয়া যাইতেছিলাম, এই খানে থামিয়া পড়িলাম, মৃণালিনী সহসা বলিয়া উঠিল "উদার বটে!"

আশ্চর্য্য! ঠিক এই কথা সে দিন মায়াও বলিয়াছিল; আমি থতমত খাইয়া মৃণালিনীর মুখের দিকে চাহিলাম। মৃণালিনী বলিল "তারপর!"

কি আর বলিব? আমি তখন সমস্ত কথার

থেই হারাইয়া ফেলিয়াছি—বলিলাম, "তারপর আর কি? প্রাণকৃষ্ণ বাবুর খবরের কাগজ পড়া শেষ হইলে আমরা বাহিরে আসিলাম।"

মৃণা। অবশ্য হৃদয়টি সেই ঘরের মধ্যে রাখিয়া?

আমি। আমি first sight-এ love বিশ্বাস করি না—নইলে বলিতাম "হঁ্যা।"

মৃণা। তবে সে জন্য যে নিতান্ত বহু দর্শনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাও ত' বোধ হয় না।

আমি। এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না! এখন বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে; কিন্তু তখন বিনা লজ্জায় এক সপ্তাহ পার না হইতেই আমি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট মায়ার হস্ত প্রার্থনা করিয়া বসিলাম। ওঃ সে দিন কি ভয়ঙ্কর দিন! সে দিনের সে অভিসম্পাৎ লইয়া চির জীবন আমাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। সেই দিন জানিলাম মায়া আমার হইবে না; তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে! তাহার অসুখের জন্য কিছু দিন বিবাহ স্থগিত রহিয়াছে মাত্র! শুনিলাম,—শুনিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইলাম; কিন্তু সেই জন্যই কি আমার দগ্ধ যন্ত্রণা! না। এরূপ নৈরাশ্যের কষ্ট অনেকেই ভোগ করে, এবং তাহা অতিক্রম করিয়া আবার মাথা তুলিয়াও দাঁড়ায়! আমার এই ভয়ঙ্কর

সে জন্য নহে—"

আমি থামিয়া পড়িলাম। মৃণালিনী সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়ন অবনত করিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল আমার হাতে পড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম "এই পর্য্যন্ত থাক ভগিনি, তুমি আর শুনিতে পারিবে না।"

মৃণালিনী কম্পিত অথচ ধীর স্বরে বলিল "পারিব, বলুন! আমি দেখি আপনি আমাকে কতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন।"

"তবে তাহাই হউক! শোন। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী ইংরাজী ফ্যাসানের।' মধ্যে একটি বড় ড্রইং রুম, উভয় দিকে দুইটি করিয়া কক্ষ। এক পাশের দুইটি কক্ষের একটিতে মায়া ও একটিতে প্রাণকৃষ্ণ বাবু শয়ন করেন; অন্য দিকের একটি আহারগৃহ এবং আর একটিতে আপাততঃ আমি থাকি। যেদিন আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল সে দিন সমস্ত দুপুর বেলা আর আমি মায়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই; বিকালে যাইব ভাবিতেছি—শুনিলাম সেখানে শশী বাবু আছেন, আর দেখা করিতে যাওয়া হইল না। শশীবাবুর সহিত যে মায়ার বিবাহ হইবে সবে মাত্র সেই দিনই আমি জানিয়াছি; তাহার আগে তাঁহাকে এখানে আসিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এ কথা জানিতাম না! সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা তিনজনে আহারে বসিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবু, শশী বাবু এবং আমি। মায়া কোন কোন দিন

আমাদের সহিত এক টেবিলে খায়, কোন কোন দিন একাকী তাহার গৃহে খায়, সুতরাং তাহাকে টেবিলে না দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্য হইল না, বা কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। আহারের পর আমরা তিন জনে ডইং রুমে আসিয়া বসিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবু একটি কৌচে হেলান দিয়া গুড়্‌গুড়ি টানিতে টানিতে অর্দ্ধ নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, আমরা দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শশী বাবুকেও আজ নিতান্ত বিষণ্ণ বলিয়া মনে হইল! আশ্চর্য্য! তাঁহার মত সৌভাগ্য হইলে আজ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখা ভার হইত! খানিক পরে শশী বাবু উঠিয়া গৃহ-কোণ হইতে একটী বেহালা লইয়া তাহার কাণ টিপিতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুন্দর জ্যোস্না, শীতের অবসানে মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস বহিতেছে; সেই বসন্ত হিল্লোলে বাগানের গাছ পালা কাঁপিতেছে, ছায়া কাঁপিতেছে এবং জ্যোৎস্নালোকও যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেহালার কোমল সুর কম্পিত রজনীর প্রাণ সহসা আরও কাঁপাইয়া তুলিল। বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাইতে লাগিল, তাহার গভীর দুঃখে নীরব রজনীকে আকুল করিয়া তুলিয়া কি এক প্রাণ-ফাটা সুর বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তখন আমি এত

বিহ্বল এত আত্মহারা হই নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তখন আমি কেবল স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন বেহালার প্রতি সুরে আমার হৃদয়ের শিরায় শিরায় নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, সেই সুরে সুরে হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল—

"সে আমার নহে! সে আমার নহে! জীবন মরুময়, জীবন শূন্যময়, জীবন মৃত্যুময়!" আমি যেন পাগল হইয়া উঠিলাম! আর সেখানে দাঁড়াইয়া বেহালার সেই মর্ম্মবিদারী আকুল গান শুনিতে পারিলাম না! গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। সম্মুখে মায়ার গৃহ; গৃহদ্বার তখনও উন্মুক্ত, কষ্টের আবেগে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানের মত তাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম—দেখিলাম মায়া জানালার কাছে একখানি কোচে শুইয়া। আমি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চন্দ্রালোকে সে সুষুপ্ত সুন্দর মুখখানি কি অনুপম সুন্দর দেখাইতেছিল! দেখিতে দেখিতে ক্রমে আর সকলই ভুলিলাম। সে আমার নহে আমি তার নহি ইহাও আর মনে রহিল না! মোহ পরায়ণ হইয়া সেই সুপ্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া বার বার প্রাণ ভরিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলাম।

মৃণালিনী সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনি! চোরের মত—"

"হ্যাঁ—আমিই এই জঘন্য কার্য্য করিয়াছিলাম, ঘৃণা

করিতেছেন করুন, কিন্তু মনে রাখিবেন আমি মানুষ —সেই অবস্থায় পড়িলে এখনও হয়ত আমি ঠিক তাহাই করিতাম! কিন্তু এ পাপের শাস্তি যাহা পাইয়াছি তাহা শুনিলে বোধ করি পাষাণেরও করুণা সঞ্চার হয়।"

মৃণালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বলুন।"

"পরদিন প্রাতে প্রাণকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "মায়া কাল রাত হইতে আবার অজ্ঞান হইয়াছে।" আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম। রাত্রিকালের ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জায় অনুতাপে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু বৃথা লজ্জা! বৃথা অনুতাপ! একথা প্রকাশ করিয়া তাহার মার্জ্জনা চাহিতে যে কখনও সাহস হইবে না, তাহা বুঝিলাম। তিন চার দিনে মায়া আরোগ্য লাভ করিল। ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবু একদিন আমাকে বলিলেন "এখনও তুমি মায়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ?" আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "কেন শশী বাবু!" তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "শশী বলিতেছে, এতদিন সে পিতা মাতাকে এ বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই এখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে তাঁহাদের ইহাতে মত নাই, সুতরাং বিবাহ করিতে সে অনিচ্ছুক।"

বলা বাহুল্য সহসা আমি স্বর্গ হাতে পাইলাম। দুই চারি দিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।"

(৩)

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি নিশ্বাস লইতে থামিলাম। মৃণালিনী বলিল, "তারপর?"

"তারপর? তারপর জানিলাম কিছুতেই জীবনে সুখ নাই। যাহার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যাহাকে পাইলে জীবনের সুখ পূর্ণ হইবে ভাবিয়াছিলাম—তাহাকে পাইলাম, কিন্তু সুখ পাইলাম না।

"আমার কর্ম্মস্থলে যাইতে এখনও প্রায় সপ্তাহ কাল বাকী আছে। বিবাহের পর সেই কয় দিনের জন্য আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবুর গঙ্গার ধারের একটি বাগানে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু মনে সুখ থাকিলে তবেই প্রকৃতির শোভা সুখজনক। মায়ার এখন আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, তেমন মন খুলিয়া সে আমার সহিত কথা কহে না, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। আমি আদর করিলে মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাব চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পর অধিকতর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠে, আমার কাছ হইতে উঠিয়া সরিয়া বসে। ইহাতে কাতর দেখিলে সে যেন কি বলিতে যায়, কিন্তু পারে না, মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চায়। আমি বুঝিলাম সে আমাকে ভালবাসে না, শশীকেই ভালবাসিত; তাহার সহিত বিবাহ হয় নাই, তাই তাহার এ ভাব! আমি মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলাম।

"একদিন দুজনে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছি, তখন জ্যোৎস্না পক্ষ; আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান, জলে তাহার ছায়া নৃত্য করিতেছে; জ্যোৎস্নায় দিক্‌দিগন্ত চিত্রপটের মত প্রতিভাত হইতেছে, জলে সহস্র রশ্মি ঝক্‌মক্‌ করিয়া তরঙ্গিত হইতেছে, পার্শ্বের ছায়া তাহাতে আরও ঘনঘোর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—আমাদের মনের অন্ধকারও এই সুন্দর দৃশ্যের সংস্পর্শে আরও গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা গঙ্গার বক্ষে বেহালার সুর বাজিয়া উঠিল; মায়া চমকিয়া সেই দিকে চাহিল —উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—সেই দিনও ঐ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল,—ঐ বুঝি—ঐ সে—"

"কে ?"

"শশী বাবু। ঐ সুরে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার দোষ নাই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, —এই কথা বলিব বলিব করিয়া আমি বলিতে পারি না, আমাকে ক্ষমা কর—"

"আমি বুঝিলাম, সে কি বলিতেছে। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া উঠিল—তবু বলিতে পারিলাম না যে সে ব্যক্তি শশীবাবু নহেন—আমি! লজ্জায় আমার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। সে আবার বলিল, "সেই দিন দিনের বেলা আমি শশী বাবুকে বলিয়াছিলাম— তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না, আমি তোমাকে

ভালবাসি। তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন, আমার বড় দুঃখ হইল। আপনাকে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাহার পর যখন অন্য ঘর হইতে তাঁহার বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয় প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া উঠিতে লাগিল; একটু পরেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। সেই সুর, সেই বিলাপ আমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল, আমি তাঁহার জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ দুরাত্মা সেই অসহায় অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করিয়াছে! আমাকে ক্ষমা কর, আমার দোষ নাই। আমি তোমাকেই ভালবাসি।" আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল; আমি প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিতে যাইতেছি, "শশিবাবু নহেন আমিই সেই দুরাত্মা'—আর বলা হইল না, সহসা অজ্ঞান হইয়া মায়া সেই উচ্চ সোপান হইতে জলে পড়িয়া গেল, মুহূর্ত্তকাল আমি স্তম্ভিত বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর আমিও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম কিন্তু—"

মৃণালিনী এই সময় সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "ভাই, আমি মরি নাই বাঁচিয়া আছি! যদি কেবল একবার তখন আজিকার এই কথা বলিতে!"

লজ্জাবতী

(১)

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোট বেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল; কোন দোষ করিলে পিতা মাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন অমনি সে লজ্জাবতী-লতাটীর মত সঙ্কুচিত জড় সড় হইয়া পড়িত। তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ দুটি জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিত তাই, তাহার বাপ মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে তাহার হৃদয় মাধুর্য্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহারা সাদরে ইহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর গৃহে লজ্জাবতীর এই অকৃত্রিম বিনয়-নম্রতা প্রভৃত শিশুসুলভ সরল লজ্জামাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারে নীরবতার গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌঁছে কি?

সে ত' প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাড্‌রা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুর সাক্ষ্য কয়জন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার দোষই সপ্রমাণিত হয়; সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতার আদরের ছিল সেই স্বভাবের গুণেই শ্বশুর-গৃহে প্রতিপদে তাড়না সহ্য করে।

শীতের প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের অগ্নিগোলক জলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিক্ বিদিক্ বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে লজ্জাবতী দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়ালে সূর্য্যকিরণ ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে; ভাবিল কতই না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র আকাশের দিকে চাইয়া সসম্ভ্রমে সূর্য্য প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার 'মা' তখনও রান্নাঘরে আসেন নাই; দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে; সে তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির ভাবে কুটনার আয়োজন করিয়া লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল। সেদিন তাহার রাঁধিবার পালা নহে, বড় বৌ

রাঁধিবেন সে যোগাড় দিবে মাত্র। তাহার কুটনা কুটা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময় শ্বাশুড়ী আসিয়া সহাস্য মুখে কোমলস্বরে বলিলেন—"বৌমা, শুনেছ—?"

দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে—এমন সাদরে শ্বাশুড়ী তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে নাই, সে তাঁহার দিকে চাইতে গিয়া থতমত খাইয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল।—শ্বাশুড়ী বলিলেন—"শুনেছ ফুলকুমারী আসছে—!" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া আশ্চর্য্যব্যঞ্জকস্বরে বলিল— "ঠাকুরঝি!"

আশ্চর্য্য হইবারই কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়া অবধি কখনও এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে—বিবাহের পর একবারও সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুর ধনী লোক, পুত্রবধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে অপমান জ্ঞান করিতেন, শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাই এতদিনে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শ্বাশুড়ী আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বৌমা, বড় মানুষের বৌ—এতদিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কমি না হয়।"

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে ডুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল "আজ যে এই সুপ্রভাত

আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী উষাময়ী প্রতিমা! তাহার আগমনে এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনে বুঝি প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে!

এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২)

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনের পর ;—চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্ব্বোৎসবের ধুম, কাহারো মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া আনন্দ-কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো।"

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলেই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতা বেড়ী ফেলিয়া মাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া

উঁকি মারিল। রন্ধন গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত্ত পালকী,—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান্ এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার-বিভূষিতা দুই দাসী, উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল,—ধনীর নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা-সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে?

কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী অসামান্যা রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন নিমেষে তাহার বিরস ভাব দূর হইল, হৃদয় এক উত্তাল আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্না, ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড়বৌ রাগিয়া বলিলেন "ও আবার কি সোহাগীপণা"! সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কাজের সময় ওসব ন্যাকরামি ভাল লাগে না, কি হাসিই পেয়েছ!" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বড়বৌ আবার বলিলেন, "ভ্যালা আছুরেপণা

শিখেছিলি! আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ফলাস্; আমাদের ওসব ভাল লাগে না”—এই কথায় তাহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

*　　　*　　　*

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে—এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি দুগ্ধ ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড়বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “একি করেছিস্ লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?”

বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোমটার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল “তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ী আসিস্? এখন বোস্, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকলেই বুঝ্‌ব রুচলো না।”

“মরে যাই আমি কি রাক্ষস নাকি? ও কে, বড়বৌ?”

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন—“তা জানিস্‌নে ফুলি! ও ছোট বৌ! কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও ত একবার পাঠালে না,

এত করে বল্লুম—তা একবেলাও না, এমন জান্‌লে কি অমন ঘরে মেয়ে দিই!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল "এই আমাদের ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল," বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোম্‌টা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। ফুল বলিল "ওমা বেশ বৌ হয়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোট বৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটী ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

(৩)

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা, সমস্তক্ষণ তাহার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে,—লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীর চরণ ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া দোতালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পুঁটুরাণী আসিয়া বলিল—"মা আমার ফুল কাঁটা ফিতে দে, পিসিমা চুল বেঁধে দেবে।"

লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সে কি, তোর ফুল কাঁটা ত আমি রাখিনি!" মেয়ে বলিল—রাখিসনি কি! সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি আমি তোর কাছে রেখে এলুম!"

"কই আমিত তা জানিনে; আমাকে ত ব'লে আসিস্‌নি?" মেয়ে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক! কিন্তু মা যে তুলিয়া রাখেন নাই সেটাত আর তাহার দোষ নহে! সে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল—"কাছে রেখে এলুম—তা তার বলে আস্‌ব কি! শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।" লজ্জাবতী নিজের দোষটাই মনে মনে মানিয়া লইয়া, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া গহনা খুঁজিতে আবার নীচে নামিলেন,—আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল "দিদিমণির বিছানা ত করে এনু—তা গায়ের নেপ কি দেব—একটা দাও।" ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল গৃহিণী একাকী ছিলেন; দাসীর কথায় তিনি তাহার তলপী তলপা খুঁজিয়া একটাও ভাল লেপ পাইলেন না,—সবই ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড় মানুষের বৌকে গায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তবে বিপদে পড়িলে যাঁহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন; মুহূর্ত্তের

মধ্যেই উপায় আবিষ্কৃত হইল, দাসীকে বলিলেন "ছাখ, আজ ত হেম পশ্চিম যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের নেপটা ফুলির বিছানায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি —এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস্।"

দাসী চলিয়া গেল, খানিক পরে আসিয়া বলিল —এমন অগোছাল বৌও দেখিনি। পুঁটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল—তা হারিয়ে খুঁজতে লেগেছে; তাই তাকে আর বলতে পেনু না; আপনিই নেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে' এনু।"

"গহনা হারিয়েছে! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো ফুল! দেখ' মা আমাদের শেষে দয়ে মজিও না! তোমরা সব হারাবে—আর আমরা গরীব মানুষ যেন মারা না যাই"—

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুন হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে—আর কি না পোড়ারমুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল! তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন— "শুনেছিস্? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে! এই সেদিন চেলির কাপড় খানা হারালে আবার আজ এই কীর্ত্তি! এমন উড়নচণ্ডী বৌ"—

ফুল বলিল—"মা, তা বৌ ত আর ইচ্ছে করে হারায় নি।"

ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "তুমি ত বাছা বৌয়ের গুণ জান না তাই ওকথা বলছ, দিন কতক থাক তখন বুঝবে! দেখতে মুখখানি অমন—পেটে পেটে দুষ্টমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে! আর গহনা ত ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তুই আজ বাড়ী এসেছিস তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।"

বড় বৌ কোন কথা কহিল না; ফুলকুমারী বলিল, —আচ্ছা দেখে আসি ব্যাপারটা কি হয়েছে? তিন জনে মিলিয়া তখন ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না, ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইতেই শাশুড়ির তীব্রস্বর তাহার কাণে পৌঁছিল—"কি গহনা আবার হারিয়েছিস! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে!) বাড়ীতে আর লক্ষ্মী রইলো না! পরের বাড়ী মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হোল তখন লজ্জায় না মুখ কালী হয়ে যাবে!"

লজ্জাবতী মৃদুস্বরে বলিল, "ওর শ্বশুর-বাড়ীর গহনা নয়; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলুম।"

"বটে! তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেন তাই হারিয়েছে? তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে!

দোষ করলেই কথা কইতে হয়—তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ীর তুলনা! দেখলি বাছা ফুলি, দেখ—একবার তোর মায়ের অপমানটা দেখ"—

বড় বৌ বলিল, "হ'লেই বা বাপের বাড়ীর গহনা, জিনিষটাত হারাল!"

শ্বাশুড়ী বলিলেন—"হারাক্—হারাক্ সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি, হরিমোহন ঘোষের মেয়ে আমি—তাই,—অমন বৌ নিয়ে ঘর করছি! নইলে আর কেউ হ'লে বাপ বাপ ডাক ছাড়ত! আয় বাছা, তোরা কেউ কথা ক'সনে।"

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল কথা তাঁহার কাণে উঠিল, মা নানা কথার পর বলিলেন—"বাছা তোদের ত এখন ঘর সংসার হয়েছে, আমাকে ত আর দরকার নেই—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না!" ছোট বাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশ যাইবার দিনে যত হেঙ্গাম! তিনি ত গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন। কেবল বকিলেই রক্ষা ছিল,—

বলিলেন "আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম আর ফিরিব না!"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে ত এতটা কিছুই হয় না; কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে মুখ দিয়া কথা ফুটিল না! বিদায়ের দিনে এইরূপ স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়া স্বামী যখন চলিয়া গেলেন সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি! যেরূপ স্বভাব লইয়া সে জন্মিয়াছে!

(৪)

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, তাই আপনার বাড়ী হইয়াও এ বাড়ীর সবই যেন তাহার চোখে নূতন। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় হইয়াছেন, ঘরে ঘরে বালক বালিকার নবমুখ—সকলই তাহার কাছে নূতন, সর্ব্বাপেক্ষা নূতন লজ্জাবতী, এবং তাহার প্রতি বাড়ীর ব্যবহার! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা, তাহাকে মা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্য্যন্ত—এমন কি দাসীরা পর্য্যন্ত বকে! তাহার কি দোষ, কোন দোষ আছে কি না ইহা বিচার করিয়া

দেখাটাও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না,—লজ্জাবতীও কখনও নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল—তাহার হৃদয় মমতার্দ্র হইয়া পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ হইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, মা তাহাতে আরও বেশী রাগিয়া যান। এদিকে নিষ্ফল হইয়া সে সন্ধ্যার পর লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। গৃহ-দ্বারে আসিবা মাত্র দাদার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, ফুলকুমারী ভিতরে না গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। তখনই প্রায় দাদাকে গৃহের বাহিরে আসিতে দেখিয়া বলিল "দাদা বৌকে বকছ, আমিত বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"—দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তবে দোষ কার?"

"দোষ যদি ধর্ত্তে হয় ত পুঁটুরাণীর, নইলে কারো নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলে, তাহলে ত আর চুরী যায় না।"

"কিন্তু মায়ের মুখের উপর অমন চোপা করার কি দরকার ছিল?"

ফুলকুমারী একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "দাদা সেটা ঠিক চোপা নয়, মা যদি বুঝে দেখতেন, তাহলে তাক্তে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড় হয়েছেন এক

বুঝতে আর বুঝে বসেন। কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝনা। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী যাকে কি বলিয়াছিল, ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে ?"

"না"।

"তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্য্যন্ত ওরূপ করে বকলে ওর কিরূপ কষ্ট হয়! বিশেষ আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে বকে যাচ্ছ তোমার একটু মায়া করে না দাদা ?"

দাদা আর কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন; শয্যায় আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া কহিলেন "লজ্জাবতি, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি ? এতক্ষণ সব খুলে বল্লেইত আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে, ভুলে যা লক্ষ্মীটী, আর কখনও তোকে বকবনা; আমায় মাপ কর।" লজ্জাবতী গভীর সুখে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

(৫)

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—রাত্রি গভীর, চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না। গভীর কষ্টের পর

স্বামীর প্রেমাদর পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনও আস্তে আস্তে উপভোগ করিতেছে। এক এক বার তাহার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন?—কে বলিল? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, "বৌ এখনো বিছানায় যাস্‌নি।" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি তুমি এখনও শোওনি?"

ঠাকুরঝি বলিলেন—"আমি শুয়েছিলুম, বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম, দাঁড়া প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না।" ফুলকুমারী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া বৌয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বার বছর বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা তখন কি তুই এর চেয়েও ছোট ছিলি! তোকে এখনো এমন ছোট দেখতে! মনে হয় যেন কনে-বৌটি!"—বৌ একটু হাসিল—ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল "তুই ভাই অমন কেন?

"কেমন?"

"যেখানে তোর দোষ নেই সেখানেও কথা কোসনে?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়, কে জানে আমি কি রকম করে বলি—সবাই ভুল বোঝে ?"

"দাদাও ? কেন আমি দাদাকে বুঝিয়ে বলতে ত তিনি সব বুঝ্‌লেন ?"

তবে ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ লইয়া স্বামীকে সব কথা বলিয়াছে ! তাহার জন্যই সে স্বামীর আদর পাইয়াছে। কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল "তিনি কিছু বল্লে আমায় বড় কান্না পায়।"

"তাইতে কোন কথা ফুটে বলা হয় না ? বুঝেছি !"

"না তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হ'য়ে তারপর আর জিজ্ঞাসা করেন না।"

"হায়রে আমার অভিমানিনি ! কে জানে ভাই তোকে সবাই বকে কি করে ! কি করে তোর উপর রাগ করে !"

"দিন কতক পরে তুমিও বকবে ! দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোকে থাকতে পারে না।"

"কক্ষণো না"।

"যদি দোষ করি ?"

"তাহলেও না। তোকে যে সকলেই বকে—আমি আবার কোন্ প্রাণে বক্‌ব !" লজ্জাবতী তাহার হাত দুটি ধরিয়া টিপিয়া বলিল—"তাও নাকি কথনও হয় !"

আনন্দ-সজল নেত্রে খানিক পরে ফুলকুমারী চলিয়া

গেলেন, বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য, অকৃত্রিম সখীত্বভাব তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল; সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোর বেলা উঠিতে গিয়া দেখিল মাথা বড় ঘুরিতেছে —আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া মশারীর দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল, "বৌ তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল 'না'।

ফুলকুমারী বলিল—"কিন্তু তুই যে কাঁপছিস্ শীত কর্ছে? গায়ে কাপড় দে না।"

লজ্জাবতী বিছানার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল "আমার নেপটা কই দেখছিনে ত"—গোলমালে শাশুড়ির দত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা সারারাত নেপ না গায়ে দিয়ে অমনি কাটিয়েছিস্! কেন তোর নেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শুক'তে দিয়েছিল, তুলে দিতে

ভুলে গেছে”—বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছানার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, “সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিস্‌নে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্চে।”

বৌ হাসিয়া বলিল “এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।”

“কেন—চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা? তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।”

লজ্জাবতী জিব কাটিয়া বলিল, “ঠাকুরঝি—ক্ষেপেছ নাকি? সত্যি আমার কিচ্ছু হয় নি।” এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল “আমার মাথা খাস্‌ তুই শো,—”

এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, “এই তোমার লেপ রইলো গো,—কাল আনতে ভুলে গেছনু—তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে আজ কি আর রান্না বান্না করতে হবে না?”

লজ্জাবতী বলিল “চল যাচ্চি”।

দাসী গেল, ফুল বলিল—“আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি।”

বৌ কাতর হইয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে সে কি করে হবে ?"

"কেন তাতে কি হয় ! তবে আমি তোর এত পর,—বেশ !" এই কথা বলিয়া ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল "শোন ঠাকুরঝি —না, তা নয় ! কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া সে আমার !"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল—ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল "ছি ছি তাও কি হয় ! না ঠাকুরঝি সে কোন মতে হবে না !"

"কোন মতে হবে না ! বেশ তুই রাঁধগে আমি কিন্তু সে রান্না খাব না।" ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল,—লজ্জাবতী ডাকিল—"ঠাকুরঝি !" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না—সে তাহার ঘূর্ণ্যমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িল। এখনও একদিন যায় নাই ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল। সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহপ্রসূত,—কিন্তু তবুও তাহাতে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইল, দুঃখে অভিমানে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, কাঁদিয়া মনে মনে সে

কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল! আমার মরণই ভাল।

(৬)

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল, ফুল উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বড়বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে—বড়বৌ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতী উনুনে ডালের হাঁড়ি—ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে "বৌলো! তেল চড়বড় করে এলো এখন তরকারী গুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয়! চড়বড়ানি আগে থামুক তখন দেবে—" ফুল বলিল "ঐ লো বৌ ডাল উথলে উঠলো! কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি।" সে আসিতে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের, তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী, এই ঘটনায় এমনি সে ব্যথিত হইয়া পড়িল! সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় খাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন,

"ওমা তাইত! সত্যিই ফুলকুমারী রান্‌ছে—আমার বিশ্বাস হয় নি! আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে! বলি সব রাজার ঝিরা! ননদ্ দুদিন মাত্র থাকতে এসেছে তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হল না!"

বড় বৌ বলিল "আমিত সেই অবধি বারণ করছি, তা ঠাকুরঝি ত শোনে না কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে, না পারে—আমি রাঁধছি, তোর কে বাবু আসা!"

খাশুড়ী। "ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন! দেখ ফুলি, আমি আজ মাথামুড় খুঁড়ে মরব! এদিকে আয় বলছি, মাইরি—এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি!"

বড় বৌয়ের প্রতি ফুল ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাকে বলিল, "না মা আমি সখ্ করে রান্‌তে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারীটা রেঁধে যাচ্ছি—তুমি যাও।"

মা বলিলেন, "তুমি রাঁধবে, আর বৌরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে? আয় বলছি, নইলে আমি রক্ষে রাখব না"—বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া তাহাকে এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এ মুখো হইবার যো রহিল না।

(৭)

লজ্জাবতী তাহার অসুখ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

বড়বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুঁটু রাণী পিসিমাকে ডাকিল "পিসিমা ভাত এসেছে খাওসে গো।" মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোটবৌকে না দেখিয়া বলিলেন, "রাজার ঝির বুঝি আর এদিকে আসতে নেই!" পুঁটুরাণী বলিল "মায়ের বড় অসুখ করেছে সে শুয়ে পড়েছে।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "সব ভাণ, কাজের নামে অমনি অসুখ!"

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল—বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, "না, মা, সকাল থেকে তার অসুখ করেছে—রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।"

"মা বলিলেন—"অমনি বাড়াবাড়ি হোল! একটু বুঝি মাথা ধরেছে আর পড়ে আছে। গেরস্থের বাড়ী অত বড়মানুষী কল্লে চলে না।"

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার

গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন। লজ্জাবতীকে দেখিয়া শ্বাশুড়ীর জ্ঞান জন্মিল যে, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ! আগুন যে! বৌ শীতে কাঁপছে, লেপটা আবার গেল কোথা? কাল ত বৌয়ের বিছানায় মোটেই লেপ ছিল না—সারা রাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বড় মানষের ঝি! একটা লেপ দিয়েছিলুম তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। গেরস্থঘর এক দিন কি নিজের ভাল লেপটা নইলে চলে না! না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম—তার জন্মে একেবারে অসুখ বাধান!"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শ্বাশুড়ী তাহার লেপের পরিবর্ত্তে অন্য লেপ তাহাকে দিয়াছেন। সুতরাং সকালে রন্ধন-গৃহে যাইবার সময় বিছানা তুলিতে গিয়া ছেঁড়া লেপ খানা দেখিয়া ভাবিল, দাসী লেপটা বদল করিয়া আনিয়াছে—তাই পুঁটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক, এখন একটা লেপ পাঠিয়ে দেও দেখি!" শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জাবতীর সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমি জোর করে রাঁধলুম না, তাহলে ত তোর অসুখ হোত না!"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল,

"না আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি তোমার আর রাগ নেই—তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে !"

ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল "আর আমি কখনো রাগ করবনা—বল ভাই তুই কিছু মনে করবি নে !"

লজ্জাবতী কোন কথা কহিল না, তাহার মাথা ফুলের বুকে রাখিয়া গভীর প্রশান্তসুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল !

বুঝি বা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল ! ইহার পর আর সে কাঁদিল না,—স্বামী যে কথা দিয়াছিলেন, ফুল যে কথা দিয়াছিল তাহা ঠিক রহিল—আর লজ্জাবতীকে তাঁহাদের বকিতে হইল না !—কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রোগ-শয্যা হইতে একেবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল।

শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "আহা গেলো গো—নিজের দোষে প্রাণটা খোয়ালে ! রাগ করে লেপটা গায়ে দিলে না গা ! রাগ করে বল্লে না যে অসুখ করেছিল !"

দাসী, চাকর, যা, সকলেই এই এক ধুয়া ধরিয়া কাঁদিলেন,—কেবল একটি গভীর শোকক্লিষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মান্তিক

দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল,—"হায় হায়, কি করিলাম! কেন তাহার উপর রাগ করিয়াছিলাম। বুঝিবা সে ঐ অভিমানেই গেল—বুঝি আমিই তাকে মারিলাম! একবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি—একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই,—আদরের ভিখারিণি, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকিবে।

নূতন বালা

বিহারীলাল সেন বংশে সম্ভ্রান্ত, স্বভাবে গর্ব্বিত কিন্তু অবস্থার দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যবসায় ধরিতে হইয়াছে কেরাণীগিরি অর্থাৎ খোসামুদি। এজন্য হাড়ে হাড়ে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে তাঁহার একমাত্র পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশা না ভোগ করিতে হয়, যাহাতে সে মানুষের মত মানুষ হইতে পারে, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতে তাহাকে ইংলণ্ড পাঠাইয়াছেন। টাকা কড়ি যাহা কিছু জমাইয়াছিলেন এই দায়ে সকলি নিঃশেষ হইয়াছে, অথচ এখনও পুত্রকে আরও হাজার টাকা না পাঠাইলে নয়; তাহার পর সে পাশ হয় ত সকল কষ্টের সার্থক, নহিলে ভগবান যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন! বিহারী বাবু কর্জ্জের আশায় কদিন ধরিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের বাড়ী হাঁটিতেছেন, পাঁচশত টাকা কোন রকমে জুটিয়াছে, আর ৫০০ কোথায় পান? পৈত্রিক সম্পত্তি বসতবাড়ী—তাহা পূর্ব্বেই বাঁধা পড়িয়াছে, গহনাপত্র যাহা ছিল তাহাও সব গিয়াছে, এ অবস্থায় ৫০০ পাইয়াছেন এই ঢের, আর ৫০০ মেলে কি করিয়া? বিহারী বাবু নিরাশ

রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—"ওগো হেমার জ্বর ত কই সারছে না; এইবার ডাক্তার ডাকাও।"

কর্ত্তা বলিলেন—"একোনাইট দিয়েছিলে? সামান্য জ্বরে আর ডাক্তার ডেকে কি হবে? আরো দু চার দিন দেখা যাক।"

আসল কথা ডাক্তারের পয়সার অভাব; কিন্তু স্ত্রীর সাক্ষাতে সে দুঃখের কথা ফুটিয়া বলিতে জিহ্বা সরে না! স্ত্রী মনে মনে ইহা বুঝিলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু পরে বলিলেন—"মাণিকের চিঠি পেয়েছি, পাঁচশ টাকা পাঠিয়েছে।" এই বলিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠিখানি খুলিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। বিহারী বাবু পড়িলেন।—

"বহুৰ প্রণামা নিবেদনঞ্চ——

দিদি—বুড় বয়সে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যদি টাকারই সঙ্গতি নাই, পরের ভিক্ষার উপর নির্ভর, তাহা হইলে ছেলেকে যে বিলাত পাঠান কেন—তাহাত বুঝিতে পারি না! আমার নিজের স্ত্রী পুত্র আছে, তার উপর তোমাদের খরচও চালান আমার সাধ্য নহে, আমি বলিয়া খালাস। তবে সেনমহাশয় আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—তাঁহার ঋণ আমার পরিশোধ করিতে হয়। এই সঙ্গে সেই জন্য পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া

দিয়েছি। ইহার বেশী পাঠাইতে আমি বাধ্যও নহি, আমার ক্ষমতাও নাই, পারিবও না। অতএব আমাকে আর রোজ রোজ টাকার জন্য লিখিয়া বিরক্ত করিও না।

সেবক

শ্রীমাণিকলাল দাস।"

মাণিক গৃহিণীর ছোট ভাই। বিহারী বাবু তাহাকে সন্তানের ন্যায় নিজগৃহে লালনপালন করিয়াছেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন, এখন বৎসর কয়েক মাত্র সে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কর্ম্মস্থলে গিয়াছে। বিহারী বাবুর এই কষ্টের অবস্থায় আপনা হইতে সাহায্যের নামও করে নাই, তাঁহারাও ইহার আগে আর তাহাকে কিছু বলেন নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এবার গৃহিণী ভ্রাতার নিকট ১০০০ টাকা কর্জ্জ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

চিঠি পড়িয়া বিহারী বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মর্ম্মে মর্ম্মে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ কেবল তাঁহার অপমান নহে—তাঁহার স্ত্রীর অপমান, তাঁহাদের আজীবন স্নেহের অপমান। বিহারী বাবুর গর্ব্বের অনেক খর্ব্ব হইয়াছে, তিনি ঢের সহিয়াছেন এখনও সহিতে প্রস্তুত; কিন্তু আত্মীয়তার স্থলে, ভালবাসার স্থলে এরূপ অবজ্ঞা,

এরূপ অপমান এখনো তিনি অবাধে গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন "টাকা ফিরাইয়া দাও, আমি চাহি না।" গৃহিণী বলিলেন,—"সেও কি হয়? ছেলেকে এত দিন টাকা পাঠিয়ে আর একটুর জন্য সব মাটি করবে; না হয় দুটো কথা বলেছে, অসময় হলে সব সইতে হয়। এ মেলে ত টাকা পাঠাতেই হবে।"

বিহারী বাবু বুঝিলেন কথাটা ঠিক, এ অপমানও তাঁহার সহিয়া চলিতে হইবে, তিনি নিরুপায়। তিনি নীরবে এই বিষবড়ির উপাদেয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন। গৃহিণী বলিলেন "যদি ভগবানের ইচ্ছায় পাশ হয় ত সকল দুঃখ ঘুচবে; দুদিন সয়ে যাও।"

বিহারী বাবুর নৈরাশ্যাভিভূত হৃদয় এই সুখের দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইল, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া চারিদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তথাপি মাতার আশীর্ব্বাদই ফলিল, অল্প দিনের মধ্যেই খবর আসিল, নলিন সিভিল সার্ভিসে পাশ হইয়াছে। সে দিন এ বাড়ীতে কি মহানন্দ। খবর পাইয়া বিহারী বাবু স্ফীত হৃদয়ে ধরাখানাকে সরার মত জ্ঞান করিতে করিতে আফিসে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী সে পরমানন্দ নিজের মধ্যে রাখিবার স্থান না পাইয়া হাতা বেড়ী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া তাঁহার পীড়িতা কন্যার নিকট আগমন করিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা হেমপ্রভা জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় শয্যালগ্ন

ছিল, মা আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া বলিলেন, —হেমা, তোর দাদা পাশ হয়েছে।”

হেমা চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিল ; মা আবার বলিলেন,—তোমার দাদা পাশ হয়েছে।” হেমপ্রভার মলিন মুখও এই কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে বলিল,—“দাদা কবে আসবে ?” মা বলিলেন—“শীগ্‌গির।” হেমপ্রভা বলিল,—“আমি ত দেখতে পাব ?” আনন্দ-আগ্রহে গৃহিণী এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হেমার অসুখ, এই কথায় আত্মস্থ হইয়া সোৎকণ্ঠস্বরে বলিলেন, “বালাই, ওকি কথা। দেখতে পাবি বইকি।”

কিন্তু এবার মাতার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইল ; ভ্রাতার সহিত তাহার দেখা হইল না ; এ বাড়ীর নূতন সংবাদ পুরাতন হইতে না হইতে হেমার ক্ষুদ্র প্রাণ অবসিত হইল। পিতামাতা আনন্দে নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী শোকে মুহ্যমান। বিধাতা তাঁহাকে দুইটী সন্তান দিয়াছিলেন একটীকে আবার নিজের কাছে ডাকিয়া লইলেন, একটী মাত্র অবশিষ্ট। কন্যার শোকে বিহ্বল হইয়া পুত্রের আগমন-পথের দিকে চাইয়াই তিনি প্রাণ ধরিয়া আছেন ; পুত্রই এখন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। নলিন কবে আসিবে, তাহার বিবাহ দিবেন, নাতিপুতি হইবে, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে তিনি মরিতে পারিবেন,

কন্যার শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল কথাই কহেন, ইহাই তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য। একদিন ভাবিনীর মা ভাবিনীকে লইয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন, ভাবিনী হেমপ্রভার সমবয়সী, প্রায়ই তাহার সহিত খেলিতে আসিত। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন; মাতা কন্যা সজলনেত্রে যখন তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন, তিনি ভাবিনীকে কাছে টানিয়া বলিলেন,—"মাগো কাকে দেখতে এলি বাছা, সে যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে।" ভাবিনী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; গৃহিণী সজলনেত্রে, সতৃষ্ণ আগ্রহে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন,—"মা আমার, তুই আমার বুকে আয়, তোকে বুকে করে আমায় প্রাণ জুড়োক্। তুই আমার মেয়ে, আমার নলিনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।"

গৃহিণী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

(২)

যদিও অনেক দিন হইতে ভাবিনী ও নলিনীর মাতা পরস্পরকে বেয়ান বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এত দিন তাহা রঙ্গের সম্বোধন বা পাতান সম্পর্ক বলিয়াই গণ্য হইত। পুত্র কন্যার বিবাহের কথা প্রকৃত প্রস্তাবে

ইহার পূর্ব্বে কেহই পারেন নাই। ভাবিনীর পিতামাতা নানাস্থানে পাত্র দেখিতেছিলেন, তবে এ পর্য্যন্ত একটিও মনের মতন পান নাই, তাই ভাবিনী এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছে। তাঁহারা কিছু ধনী নহেন, ইহার উপর এক বিলাত ফেরত আত্মীয়কে দলে লইয়াছেন—এই জন্য সুপাত্র পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং বিহারী বাবুর স্ত্রী যখন নিজে হইতে ভাবিনীকে পুত্রবধূ করিতে চাহিলেন তখন তাহার পিতামাতা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন;—অমন সিভিলিয়ান জামাতা লাভ করা ত সৌভাগ্যের কথা।

বিবাহের পাকাপাকি সম্বন্ধ স্থির হইবার আগে বিহারী বাবু কেবল কুণ্ঠিতচিত্ত হইয়া একবার গৃহিণীকে বলিলেন, "ছেলে আসিয়া যদি বলে বিবাহ করিবে না? আমি বলি সে আসা পর্য্যন্ত সবুর করা যাক্!" গৃহিণী একথা একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার অমন সোণার ছেলে নাকি কথার অবাধ্য হয়। আর সবুর করতে গেলে ওরা মেয়ে রাখবে কেন? অমন সুন্দর মেয়ের ত আর বরের ভাবনা নাই, লাভে হতে শেষে ভাবিনীই তাঁহাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে!"

যেমন হইয়া থাকে—এরূপ স্থলে কর্ত্তাদেরই শেষে হার মানিতে হয়! বিশেষ এই শোকের সময় গৃহিণীর কথা অমান্য করিয়া তাঁহার ব্যথিত চিত্তে ব্যথা দিবার

পরিবর্ত্তে নিজের আপত্তিটি অযুক্তিসঙ্গত মনে করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। ভাবিনী বাক্‌দত্তা হইয়া রহিল, কেবল তাহাই নহে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সে তাঁহাদের আপনার হইয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ভাবিনী ও তাহার মাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহারা আসিলে ভাবিনীকে আর দুই চারি দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিতে দেন না। যে কয়দিন সে কাছে থাকে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া পুত্রের বিরহ, কন্যার শোক ভুলিয়া থাকেন। আর সে কাছে না থাকিলে তাহার জন্য জিনিষ পত্র কিনিয়া, তাহাকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবার আয়োজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। চুড়িওয়ালা, খেলানাওয়ালা, তাঁতিনী ইহারা তাঁহার বাড়ী আসিয়া কেহ আর শূন্য-হস্তে ফেরে না। কোন একটি ভাল জিনিষ দেখিলেই বউয়ের জন্য তিনি কিনিতে চান, কিনিতে না পারিলেই অমনি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। কাহারও কোনরূপ নূতন সাজ বা নূতন গহনা কি নূতন রকম সাড়ী জামা দেখিলে তখনি গৃহিণীর মনে হয় বৌমা এইরূপ সাজিলে তাহাকে আহা কেমন মানাইত! নিত্য নূতন ফরমাস যোগাইয়া কর্ত্তা ত আর পারিয়া উঠেন না। কাজেই অন্য পাঁচ জনকেও গৃহিণীর ফরমাসের ভার বহিতে হয়।

এক দিন নবীনের মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণীর

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরঝি তোকে ভাই মেয়ে নিয়ে পরশু একবার আস্‌তেই হবে! পরশু ভাবিনী আসবে, তোর মেয়ে যেমন জাল দিয়ে চুল বেঁধেছে, অমনি করে তার চুল বেঁধে দিবি। বুঝলিনে ছেলে বিলেত থেকে আস্‌বে—আমাদের পুরোণো সাজ গোজ তো চলবে না, নূতন রকম শিখে রাখি, এলেতো বৌমাকে সাজিয়ে দিতে হবে।"

ছেলের জন্যে তো পরে হইবে, আমরা বুঝি আপাততঃ গৃহিণীর নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই ভাবিনীর এইরূপ নিত্য নূতন সাজের আবশ্যক।

নবীনের মা বলিলেন, "তা আসব এখন, তার আর কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা ঐ রকম জাল নিয়ে আসিস্, বুঝলি ভুলিস্‌নে! যাবার সময় অমনি দামটা দিয়ে দেব।"

ভাবিনী বাড়ী না থাকিলে পানে ছোট এলাচ বাদাম পড়ে না, বাড়ীতে রুই মাছের মুড়ো কি টাট্‌কা ইলিস মাছ আসে না। যদি বা দাসী কথা অমান্য করিয়া বাড়ীতে ভাল মাছ আনিয়া ফেলে তো অমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে তখনি ভাবিনীদের বাড়ী দৌড়িতে হয়। "ওগো মা ঠাকরুণ, একবার আজ বৌমাকে না পাঠালে চল্‌বে না। মা রেঁদে বেড়ে বসে আছে তাকে খাইয়ে তবে খাবে গো।"

এ কথায় ভাবিনীর মা-ই বা কোন প্রাণে মেয়েকে না পাঠাইয়া থাকেন।

যত্নের বশ সকলেই—ভাবিনীও এখানে থাকিতে ভালবাসে—কেবল তাহাই নহে, সে জানে ইহাই তাহার আপনার ঘর। বউ না হইতেই গৃহিণী তাহাকে যেমন বউ ভাবেন, সেও তেমনি তাঁহাকে শ্বাশুড়ী ভাবে। সে কিছু নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহে, তাহার বয়স এখন ১৩ বৎসর, তাহাব সমবয়সী সখিদের সকলেরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার নিকট যখন স্বামীর গল্প করে আপনাপন ভালবাসার কথা জানায়, ভাবিনী তখন নলিনকে স্মরণ করে। উপন্যাসে যখন সে নায়ক নায়িকার কথা পড়ে, তখন তাহার মনে হয় সে যেন নিজের জীবনের কথাই পড়িতেছে। বইখানি শেষ হইলে সে পুরাতন কথা ভাবিতে থাকে। ছেলে বেলায় তাহাব যখন নলিনের সহিত দেখা হইত, তখন নলিন তাহার সহিত কিরূপ সস্নেহ-বাক্যালাপ করিত, কিরূপ যত্নে তাহাকে ছবি দেখাইত, একদিন একটী গোলাপ ফুল আনিয়া কেমন যত্নে তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছিল, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসিতে রাস্তায় যে সমারোহ হয়, তাহা দেখিতে যেদিন ভাবিনী নলিনদের বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন কিরূপ আগ্রহে নলিন তাহাকে সেই সমারোহ দেখাইয়াছিল,—এই সব কথা মনে করে

আর একটী অপরূপ আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধো আধো করিয়া অতি সসঙ্কোচে আর একটী কথা তাহার মনে আসে যে, সেই নলিনদা তাহার স্বামী। একথা মনে করিতে নিজে নিজেই সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। সে ভাবে তিনি যখন আসিবেন আমি কি করিয়া তাঁহার কাছে যাইব? যদি তিনি আগেকার মত করিয়া আমাকে আদর করেন? ছিঃ সে আমার বড় লজ্জা করিবে!

গোপন লজ্জায় সে মরমে মরিয়া যায় অথচ অতি আগ্রহে নলিনের আসিবার দিন গণনা করে।

গণনা শেষ হইল, নলিনের পরীক্ষা শেষে আরও দুই বৎসর কাটিল। নলিন আজ গৃহে ফিরিবে, বিহারীবাবু তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনিতে গিয়াছেন। গৃহিণী ভাবিনীর সাজ সজ্জা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন, আর ভাবিনী একখানি আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া চুল বাঁধা কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে কি ভাবিয়া কে জানে মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে দুরদুর করিয়া উঠিতেছে—সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। একবার সে চমকিয়া উঠিয়া ত্রস্তে আয়নার পশ্চাতে জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া

দেখিল তাহার ভয় বৃথা, কেহ কোথাও নাই। তখন নিশ্চিন্ত ভাবে জানালায় ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সম্মুখেই মিত্রদের মাঠ, মাঠের গাছগুলি বৈকালিক সূর্য্য-কিরণে ঝক ঝক করিতেছিল, অল্প অল্প বাতাস বহিয়া ঘাস দুলিতেছিল, পাতা দুলিতে-ছিল, তাহার মনে হইতেছিল, এমন সুন্দর মধুর দৃশ্য যেন আর কখনও সে দেখে নাই, রবিকিরণের মধ্যে আজ যেন কেবল পুলক কম্পনই চলিতেছে; বায়ু যেন কেবল আনন্দেরই হিল্লোল! সহসা তাহার দাদা রমাপ্রসাদ ডাকিল, "ভাবিনি, এখানে কি করছিস? তোকে যে সবাই ডাকছেন, নলিন এসেছে, আয়!" বালিকার ওষ্ঠাধারে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিত হইল, সে নড়িল না। রমাপ্রসাদ নিকটে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাইয়া একটু হাসিল, ভাবিনী লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সাজগোজ দেখিয়া যে দাদা হাসিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। রমাপ্রসাদ হাসিয়া সলজ্জা ভগিনীর হাত ধরিয়া মজলিস গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই গৃহিণী বলিলেন "চিনতে পারিস্ নলিন, ছোট্টটী দেখে গিয়েছিলি এখন দেখ কত বড় হয়ে উঠেছে।" নলিন সসঙ্কোচে বলিল, "কে?"

রমাপ্রসাদ বলিল, "চিনতে পার না? ভাবিনী!"

তখন নলিন অসঙ্কোচে নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "Hallo! এত বড় হয়েছে! How do you do, my pretty lass?"

ভাবিনীর যে ইংরাজী বিদ্যা বেশী ছিল তাহা নহে। নলিনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়া অবধি তাহার যদিও ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছার অভাব ছিল না কিন্তু শেখায় কে? দাদাকে অনেক ধরা পাকড়া করিয়াও তাহাকে দিয়া ফার্ষ্ট বুকের অর্দ্ধেকও এখনও ভাবিনী শেষ করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও সে নলিনের কথার অর্থ একরূপ বুঝিয়া লইল। How do you do চলিত কথা—pretty কথার অর্থও সে জানে, কিন্তু ass কথাটা সে ঠিক ধরিতে না পারিয়া ভাবিল, নলিন তাঁহাকে pretty ass বলিয়াছেন। ভাবিনী ইংরাজী জানে না বলিয়াই যে এই উপহাস তাহা সে বুঝিল; বুঝিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল এবং অপমানিত বোধ করিয়া দাদার উপরই তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। তিনি যদি ইংরাজি শিখাইতেন তবেত সে এতদিনে ইংরাজিতে পণ্ডিত হইতে পারিত! লজ্জায় সঙ্কোচে ভাবিনীর মুখে একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাছা, এমন সুন্দর মেয়ে বিলেতে দেখেছিস? বিয়ে করে তবে কাজের জায়গায় যাবি।"

ছেলে একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে দুই একবার কাশিল। গৃহিণী বলিলেন "বিয়ের সবি ঠিক, কেবল দিন স্থির করে নেমন্তন্ন পাঠালেই হয়, আমি বলি এই রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক।" গৃহিণী যে প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা বলিতেছেন প্রথমে নলিন তাহা বুঝে নাই। এবার বুঝিয়া সহসা কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। বিহারী বাবু ছেলের সঙ্কোচ বুঝিয়া বলিলেন, "তা এত তাড়াতাড়ি কি! কিছু দেরিতেই না হয় বিয়ে হবে।"

গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "তা বৈকি, সে হবে না। দেখ্ বাবা, বিয়ে করেই কিন্তু নিয়ে যেতে পাবিনে। ছেলে পিলে হোক,তারা আমার কাছে থাকবে, তুই তখন বৌ নিয়ে যাস্। তবে বাছা রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক—কি বলিস্?"

নলিন কোন কথা কহিল না, কি যেন বলিতে গিয়া শুষ্ক কণ্ঠে দুই একবার কাশিল মাত্র। গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে এই রবিবারেই গায়ে হলুদের সব আয়োজন করে ফেলো।"

নলিন সহসা অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিল, "না, মা কিন্তু—কিন্তু—এখন থাক্!" নলিনের এই সঙ্কোচ দেখিয়া রমাপ্রসাদ উপহাসচ্ছলে বলিল, "এত না, এত কিন্তু, এত সঙ্কোচ কিসের? একটা বিয়ে করে এসেছ না কি নলিন দা!" নলিনের বিবর্ণ মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "ও কি ঠাট্টা বাছা, অমন

কথা বলতে নেই! দেখ বাবা এবার তুই এলি, এবার আমার গহনা পত্র তো সব খালাস হবে, পুরোণ সাটের গহনা তাহোলে আর বৌমার জন্যে কিছুই গড়াতে হবে না। তবে আজ কাল নতুন ফ্যাসানের অনেক রকম গহনা হয়েছে, বাপেরা শুনচি তা সব দেবে। তবু আমারও তো দুএক খানা না দিলে ভাল দেখায় না, আমি তাই কাদির মার কাছে দুশো টাকা ধার করে পালনপাতার দু গাছা বালা গড়িয়ে রেখেছি, দিব্যি হয়েছে; আনচি তুই একবার দেখ!" গৃহিণী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বালা আনিতে গেলেন, কিন্তু পুত্রের ভাব গতিক দেখিয়া বিহারী বাবু কিছু দমিয়া বলিলেন, "এখন তোমার কি বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই?"

নলিন দুই একবার কাশিয়া দুই একবার এদিক ওদিক চাইয়া আধো বাধো করিয়া বলিল "না"।

রমাপ্রসাদ তখন হাসিয়া আবার আস্তে আস্তে বলিল, "নলিন দাদা সত্যই বিয়ে করে এসেছ নাকি?"

নলিন তাহার গা টিপিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "For Heaven's sake এখন থাম!" বিহারী বাবু একটু তফাতে কৌচে বসিয়াছিলেন সে কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু রমাপ্রসাদ যখন এই কথার উত্তরে না থামিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তবে সত্য বিয়ে করেছ? কোথায়? কার সঙ্গে? ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে নাকি?"

—তখন সহসা বিহারী বাবুর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উছলিয়া উঠিল। নির্ব্বাক্ তিনি কম্পিতহৃদয়ে উত্তর অপেক্ষায় পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্তম্ভিত নীরব নলিনীমোহন কি করিতেছে না বুঝিয়া কলের পুত্তলির মত সহসা ঘাড় নাড়িল। বিহারী বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হস্তের উপর ঘূর্ণ্যমান্ মস্তক রক্ষা করিলেন। আনন্দ-গৃহ মুহূর্ত্তের মধ্যে শোকনিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইল। গৃহিণী এই সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে আনন্দ-উথলিতচিত্তে বালা দুইগাছি ছেলের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি বাছা পছন্দ হয়? তুই আমার বৌয়ের হাতে পরিয়ে দে, কেমন দেখায় দেখি," বলিয়া ভাবিনীর উদ্দেশে চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোথাও সে?

চাবি চুরি

অদ্য রবিবারে তাহার আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন, আগামী রবিবারে বিবাহ। বি এ পরীক্ষার পর গৃহে আসিয়া মাসাবধি কাল হইতে সুকুমার এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব রজনী তাহার জাগরণে কাটিয়াছে বলিলেই হয়। একটা অনির্দ্দিষ্ট আনন্দ উত্তেজনায় তাহার মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম শিরা বিশিরা—এমন কি প্রত্যেক অণুপরমণুটি পর্য্যন্ত যেন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ভোরবেলায় সামান্য তন্দ্রা আসিতে না আসিতে উৎসব বাঁশরীর ভৈরবীতানে—একটা দুঃস্বপ্ন লইয়া সে সহসা জাগিয়া উঠিল। তন্দ্রাবেশে সুকুমার স্বপ্ন দেখিতেছিল—যেন তাহার চাবি হারাইয়া গিয়াছে।

ছেলেবেলায়—যখন তাহার বয়স সাত আট বৎসর, তখন একবার তাহার একটি চাবি হারাইয়া গিয়াছিল। তাহার মামা বাড়ী আসিবার সময় কলিকাতা হইতে তাহাকে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র জাপানী বাক্স আনিয়া দিয়াছিলেন। বাক্সটি পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। বাক্সের চাবিটি ছিল ঠিক রূপার মতন। সুকুমার দিনের মধ্যে কতবার যে বাক্সটী খুলিত, বন্ধ করিত, আবার সন্তর্পণে চাবিটি লুকাইয়া রাখিত

তাহার ঠিক নাই। এইরূপ অতি সাবধানতা বশতই বোধ হয়—একদিন তাহার সেই সাত রাজার ধন এক মাণিক চাবিটি হারাইয়া গেল। চাবির দুঃখে সে একান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িল। এতদিন সকলে ভাবিত, বাক্সটিই তাহার প্রিয়সামগ্রী, এখন বুঝিল চাবির জন্যই বাক্সের আদর।

তখন মা বাঁচিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে আর একটি জাপানী বাক্স আনাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে সুকুমারের পূর্ব্ব চাবির বিরহদুঃখ ঘুচিল না। তাহার মনে হইল—ইহা ত পুরাতনটির ন্যায় সুন্দর নহে। দু-একদিন নাড়াচাড়া করিয়াই সেটি তাহারই নামাধেয় প্রিয় বয়স্য আর এক সুকুমারকে সে দান করিয়া ফেলিল। এই বন্ধু-সুকুমার বয়সে কিছু বড় বলিয়া আমাদের সুকুমার ইহাকে সুখদা বলিয়া ডাকিত। পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আমরাও সময় সময় ইহাকে সুখনামেই অভিহিত করিব।

সুখ বন্ধুদত্ত বাক্সটি আনন্দে গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে পকেট হইতে সেই হারান চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল। মুহূর্ত্তকাল সুকুমারের মূর্ত্তি আনন্দদীপ্ত হইয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধস্বরে কহিল; "আমার চাবি! তুমি নিয়েছ! আর আমাকে দাওনি!"

সুখ বলিল—"আজ ত দিলুম। না দিলে ত তুই আজও পেতিস নে।"

বালক ভাবিল—তাহাত ঠিক! সে তখন কৃতজ্ঞচিত্তে চাবিটি গ্রহণ করিল।

আজ আনন্দপ্রভাতে সুকুমার সেই চাবি হারানর স্বপ্নই দেখিতেছিল। তফাতের মধ্যে স্বপ্নের চাবিটি রূপার নহে সোনার, আর বাল্যকালের হারান চাবিটি সে ফিরিয়া পাইয়াছিল—স্বপ্নের চাবিটি খুঁজিয়া না মিলিতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া সে যখন বুঝিল ইহা সত্য নহে স্বপ্ন মাত্র,—তখন খুব একটা আরাম বোধ করিল। তথাপি এই ফুল্লপ্রভাতে গত রজনীর কল্পনানন্দ একটা বিষাদময় ভাবে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উৎসব বাঁশরীর মধুর ভৈরবীরাগ সুরতরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া হৃদয়ে কেমন একটা করুণ তানই জাগাইয়া তুলিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার নয়নপাতে দুইবিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে উন্মুক্ত-দ্বারের মধ্য দিয়া তাহার অশ্রুবিম্বিত নয়নপটে অপ্রত্যাশিত আনন্দবিস্ময় ফুটাইয়া তুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল আসিয়া ও কে? তাহার বাল্যবন্ধু সুখদা! সূর্য্যকিরণে যেমন নিমেষে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়—সুকুমারের বিষাদম্লান হৃদয়ও সেইরূপ মুহূর্ত্তে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সে বলিল—"একি সুখদা যে! আজ সত্যই সুপ্রভাত।"

(২)

সুকুমারের বয়স বেশী নহে, আঠার মাত্র। ইহারি মধ্যে সে বি-এ দিয়াছে। ইহাতেই পাঠক বুঝিবেন, সুকুমার বুদ্ধিমান্। তথাপি সাংসারিক লোকে সম্ভবতঃ তাহাকে নির্ব্বোধই বলিবেন। কেননা এখনও সে বালকের ন্যায় সরলবুদ্ধি, কপটতা-অনভিজ্ঞ বিশ্বস্ত হৃদয়। তাহার কল্যাণবিশ্বাসময় মধুর হাসিতে, হৃদয়ের স্বচ্ছরূপ দর্পণের ন্যায় বিভাসিত। তাহার হাসিতে, মূর্ত্তিতে, ভাবে, কথায় শুভ্র বিশুদ্ধ মঙ্গলভাব প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই শতদলে বিকাশিত।

সুকুমারের সহিত তাহার বন্ধুর অনেক দিন হইতেই ছাড়াছাড়ি। সুকুমার এণ্টেন্সক্লাসে উঠিয়া পড়িতে গেল কৃষ্ণনগরে—আর সুখ্ তাহার একবৎসর পূর্ব্বেই বাস করিতে চলিয়া যায় কলিকাতায়। বনগ্রাম তাহার মামার বাড়ী—শৈশবে মাতৃহীন হওয়াতে মাতামহী তাহাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, মাতামহীর মৃত্যু হইবামাত্র তাহার পিতা তাহাকে কলিকাতায় আপনার নিকট লইয়া গেলেন।

ইহাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বড় একটা ছিল না। সুকুমার মধ্যে মধ্যে বন্ধুকে লিখিত—এবং দশ খানার উত্তরে কদাচিৎ একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইলেই

সৌভাগ্য বিবেচনা করিত। সম্ভবতঃ এইরূপ উপেক্ষাই সুকুমারের বাল্য মিত্রতাকে সুদৃঢ় বন্ধনে এখনও তাহার স্মৃতিজড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের খবর সে সর্ব্বাগ্রে সুখদাকেই দিয়াছিল—এবং উৎসবে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেও যে ত্রুটি করে নাই তাহা বলা বাহুল্য।

সুকুমার বিছানা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি মশারিটা তুলিয়া, সুখদাকে টানিয়া লইয়া আবার বিছানার উপর বসিল। কিছুক্ষণ কোন কথা না কহিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসি নীরব হইলেও মধুর আনন্দসঙ্গীতপূর্ণ। সুখ বলিয়া উঠিল "তুই ভারী ছেলেমানুষ!"

"কেন?"

"বিয়েতে এত আনন্দ তোর!"

এ কথায় সুকুমারের আনন্দভাব কিছুমাত্র কমিল না, বিনা প্রতিবাদে নীরব হাসিতে এই অপবাদ সে শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সুখ বলিল—"মেয়ে দেখেছিস?"

"দেখেছি বইকি! তুমিও ত দেখেছ। সত্যবালাকে মনে নেই?"

"সেই চার পাঁচ বছরের নোলক-নাকে, কাঁদন-চোখো মেয়েটা? কাঠের পুতুল হাতে চৌধুরীদের পুকুরধারে

বসে থাকত—আর পুতুলটা কেড়ে নিতে গেলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ত—সেই নাকি ? রামঃ !"

সুকুমারের সহাস্যসুন্দর মুখশ্রী এই কথায় কৌতুকপূর্ণ হইয়া আরও মনোহর ভাব ধারণ করিল—সে হাসিয়া কহিল—"এখন আর রামঃ নয়—সুখদা ; এখন তাকে সীতাদেবী বলাই সাজে !

"গেছি যে ! একেবারে মাথা জল—হাবুডুবু ! তোরা যে দেখছি লয়না মজনু হয়ে জন্মেছিস্ ! ভূমিষ্ঠ না হতেই দুজনের প্রেম দাঁড়িয়েছে। ছেলেবেলায় যদি তাকে একটা তাড়া দিয়েছি—অমনি আহা উহু !"

"ছেলে মানুষকে তুমি যে জ্বালাতন করতে সুখদা ! আমার ভারী মায়া হোত ! যাহক এখন আর সে চার পাঁচ বছরের মেয়েটি নেই—এখন যদি একবার দেখ !"

"সেটা বোধ হয় অদৃষ্টে ঘটছে না,—আমাকে আজই যেতে হবে। তুই বিশেষ অনুরোধ করেছিলি তাই একবার বলে যেতে এলুম।"

সুকুমারের প্রফুল্ল মুখশ্রী সহসা মলিন হইয়া পড়িল। সকাতর অনুরোধে সে কহিল—"না সুখদা তা হবে না। এ হপ্তাটা তোমার থেকে যেতেই হবে। এত কি কাজ ? —এখন ত ছুটি।"

"আমার ত বিয়ে করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয় ! তার চেয়ে ঢের মহত্তর কাজে আমি ব্রতী হয়েছি।"

"কি কাজ ?"

"দেশের কাজ।"

"স্বদেশী হয়েছ ? আমিও ত স্বদেশী।"

"নামে স্বদেশী হলে ত হবে না—কাজ করা চাই।"

"আইন পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমিও কাজ করব। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।"

"মনে মনে ঠিক করলে ত হবে না ; যে কাজই কর—আগে থাকতে ত প্রস্তুত হতে হবে—"

"আমি ভেবেছি দেশে একটা শিল্প স্কুল করব—চাষাদের জন্যে—"

"হাইহো ! আবার ছেলেমানষি ! তোর দ্বারা সংসারে দেখছি কিচ্ছু হবে না ! টাকা আসবে কোথা থেকে যে স্কুল-কলেজ খুলবি ?"

"কেন উপার্জ্জন করব ! চাঁদা তুলব—আর আমার যা সম্পত্তি আছে—তা—"

"তবেই হয়েছে ! তোর সম্পত্তি আর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করলেই দেশোদ্ধার হবে বটে ! এদেশে দেশের কাজে চাঁদা কেউ দেবে না—দিতে যারা ইচ্ছা করবে ভয়ে তারাও পারবে না। এখানে টাকা তোলার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে—"

"কি ?

"ডাকাতি। ঘাড় ধরে আদায় করা। গবর্ণমেণ্টও

ত আসলে তাই করে। দেশের কাজে আমরাই বা তা না করব কেন ?"

সুকুমারের প্রত্যেক শিরা ঘৃণাসঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—"নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ সুখদা! সত্যি যে তুমি এ রকম মনে কর—কিছুতেই আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনে। অত্যাচারে কখনও মঙ্গল হতে পারে ? দেশানুরাগ শিক্ষা দিতে হলে, ন্যায়ানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, একতা এ সব আগে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অধর্ম্মে, অত্যাচারে কেবল যে সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেবে—তা নয়—একতার মূলেই আঘাত পড়বে—"

"তোমার আর লেকচার দিতে হবে না। ওসব বাঁধা বুলি সব জানা আছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবই অবস্থানুসারে ;—ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন—

"মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে,—"

পড়ে দেখ।" পকেট হইতে একখানা গীতা বাহির করিয়া সে সুকুমারের হাতে দিল। এই সময় একজন চাকর আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু বেলা হয়েছে, উঠুন। মঙ্গল স্নান করতে হবে—মাঠাকুরুণরা ডাকছেন।"

সুকুমার বলিল—"আচ্ছা যাচ্ছি তুই এগো"। ভৃত্য চলিয়া গেলে বন্ধুনির্দ্দিষ্ট খোলাপাতায় চোখ বুলাইয়া সুকুমার কহিল—"দ্বিতীয় অধ্যায়। আচ্ছা সুখদা, এখন

থাক, বিকালে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে মিলে পড়ব এখন।” বলিয়া বইখানা সে বিছানায় রাখিল। সুখ বলিল,—বিকাল পর্য্যন্ত আমি ত থাকতে পারব না—একটার ট্রেনে আমাকে যেতেই হবে।”

বিবাহ পর্য্যন্ত কয়েকটা দিন থাকিবার জন্য তাহাকে সুকুমার অনেক উপরোধ অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া অবশেষে কহিল—“আচ্ছা আজ তবে যাও—বিয়ের দিন কিন্তু ভাই আসতেই হবে, কথা দাও।

“দেখব,—তবে ঠিক বলতে পারিনে।”

আবার ভৃত্য আসিয়া ডাকিল, দাদাবাবু এস। মাঠাকরুণরা ডাকাডাকি করছেন—শুভ সময় বয়ে যায়।”

উভয়ে তখন ভৃত্যের অনুবর্ত্তী হইল।

(৩)

গায়ে-হলুদ, স্নানোৎসব, ভোজ সকলি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চন্দনচর্চ্চিত, রক্তবস্ত্রপরিহিত সুকুমার সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, বিশ্রাম মানসে অপরাহ্ণে পালঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার বন্ধু সুকুমার আহারান্তে একটার গাড়ীতেই চলিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া গীতাখানা হাতে লইয়া খুলিতেই এই শ্লোকটি তাহার চোখে পড়িল—

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়
সর্ব্ব ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

নিবিষ্ট চিত্তে ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সুকুমার মনে মনে কহিল—"কি সুন্দর উপদেশ। আর সুখদা আমাকে কি যে বোঝাচ্ছিলেন!"

এই সময় বাহিরে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উঠিল; সুকুমার তাড়াতাড়ি বিছানার উপর গীতাখানি ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল পুলিসের লোকে উঠান পূর্ণ। একজন তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নাম সুকুমার?" উত্তর হইল,—"হ্যাঁ"। তখন বিনাবাক্যব্যয়ে তাহারা বাটীর সর্ব্বত্র প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা ভয়বিকম্পিতা হরিণীর ন্যায় ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুইজন পুলিসের লোক সুকুমারের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। বিছানার উপর গীতাখানা দেখিতে পাইয়া একজন তাহা উঠাইয়া লইয়া সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল—"গীতা গীতা"! যেন আর্কিমিডিসের ন্যায় সেও একটা কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সহসা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আর একজন সাগ্রহে তাহার হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং দুই বন্ধুতে মিলিয়া তখন গীতার পাতাগুলি মথিত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। স্থানে স্থানে শ্লোকের নীচে

যে সকল অস্পষ্ট ইঙ্গিত, মন্তব্য, টীকাটিপ্পনি ছিল পুলিসের অণুবীক্ষণ নেত্রালোকে তাহা সুস্পষ্ট বিদ্রোহিতারূপে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এমন কি ডাকাতির তারিখটি পর্য্যন্ত তাহার প্রচ্ছন্ন আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া পড়িল। এই জলন্ত অকাট্য প্রমাণ হস্তে ধরিয়া তাহারা আর অধিক জিজ্ঞাসাবাদের কোন প্রয়োজন দেখিল না, স্বাধিকারভুক্ত সম্পত্তির ন্যায় বিনাবাক্যব্যয়ে তখনই সেই পুলিস পুঙ্গব দুইটি সুকুমারকে দখল করিয়া ফেলিল।—বাড়ীতে কাতর ক্রন্দনরোল উঠিল, নিমন্ত্রণ, আনন্দজনতা মুহূর্ত্তে শোক বাত্যায় যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধরালুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে সুকুমারের মা নাই, পিতা উন্মত্ত আকুলকণ্ঠে বলিলেন—"ওকে কোথায় নিয়ে যাও? আগে আমাকে মেরে ফেল,—নিয়ে যেতে হয় —তারপর নিয়ে যেও—" এই বলিয়া তিনি একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিষণ্ণ, গম্ভীর, বন্দী সুকুমার একান্ত বিশ্বস্তচিত্তে কহিল—"বাবা আপনি ভাববেন না, আমি নিশ্চয় ফিরব, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়বিচারের প্রতি সন্দেহ করবেন না,—আমাকে যেতে দিন।" চারিদিকের ক্রন্দন রোলের মধ্যে—কন্যার পিতামহ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁদিয়া কহিলেন,—"ছেড়ে দাও বাবা, সুকুমারকে ছেড়ে দাও, আগামী রবিবারে বিবাহ, আজ গায়ে হলুদ পড়ে গেছে।

হিন্দুর সন্তান হয়ে বাবা তোমরা অধর্ম্ম করোনা। আমাদের জাত যাবে—জাত যাবে—ওকে ছেড়ে দাও, ব্রাহ্মণের দোহাই তোমাদের,—ওকে ছেড়ে দাও বাবাবা!” একজন ডেপুটি ইন্‌স্পেকটার সে সবে মাত্র পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে—এ রকম কার্য্যে এই তাহার হাতে খড়ি, ইহাদের আর্ত্তনাদে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রধান ইন্‌স্পেকটার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—“ভাবনা কি মশায়! হিন্দু হয়ে কি আমরা হিন্দুর জাতধর্ম্ম মারতে পারি? কিছু চিন্তা করবেন না—আমরা ঠিক সময়েই এঁকে ফিরিয়ে আনব।”

পিতা কহিলেন, “নিয়ে যেও না বাবারা—ওকে নিয়ে যেও না;—ও গেলে এ ব্রাহ্মণ বাঁচবে না, তোমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে।—”

সুকুমার সজলনেত্রে অথচ ধীরকণ্ঠে কহিল—“বাবা ভাববেন না, ধৈর্য্য ধরুন,—নিশ্চয় ফিরব,—আমি ত দোষী নই।” ইন্‌স্পেকটার সাহেব সহাস্যে কহিলেন “তাহলে নিশ্চয়ই ভাবনার কোন কারণ নেই। তবুও যদি না ফেরে—ঠাকুর মশায়—তাহলে কিন্তু আমাদের দায় দোষ নেই,—শাপটাপ দেবেন না,—তাহলে বুঝে নেবেন ছেলেই দোষী—অধর্ম্মের কি কখনও জয় হয়!”

দারুণ হৃদয় বেদনা—আর্ত্তনাদ হাহাকারের মধ্যে পুলিস সুকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল।

(৪)

কন্যার পিতা নাই। পিতামহ গদাধর ভট্টাচার্য্যের ঘর-বার করিয়া দিন কাটিতেছে। তাঁহাদের বাড়ীর বাহির হইতে রেলের গাড়ী দেখা যায়! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সেই দিকেই চাহিয়া আছেন,—স্নানাহারের সময় গৃহে গমন করেন মাত্র—আবার মালা জপ করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। এমনই করিয়া নিমেষ মুহূর্ত্ত যায়, দিনও কাটে, সপ্তাহও প্রায় কাটিতে চলিল—তবু সুকুমারের বা তাহার পিতার দেখা নাই। তাহার পিতাও মকদ্দামার তদ্বির করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছেন।

কন্যার মাতা ভটচাযমহাশয়ের পুত্রবধূ—শ্বশুরকে কিছু বলেন না, ভগবানকে ডাকিয়া, তাঁহার উপর একান্ত-প্রাণে নির্ভর করিয়া নীরবে ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন। কিন্তু কন্যার পিতৃস্বসা, ভটচাযমহাশয়ের বিধবা কন্যা পিতাকে অন্য পাত্রের সন্ধানে তৎপর না দেখিয়া প্রতিদিনই তাঁহাকে অনুযোগ করেন। যে সকল আত্মীয় স্বজন বিবাহনিমন্ত্রণে আসিয়া এখনও এখানে রহিয়া গেছেন তাঁহারাও অন্যান্য আমোদ আহ্লাদের অবসর সময়টুকু কর্ত্তাকে উত্যক্ত করিবার সুখ উপভোগে অতিবাহিত করিতে ত্রুটি করেন না। ভটচাযমহাশয়ের

কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস সুকুমার নির্দ্দোষ, অতএব সে ফিরিবেই, যথাসময়ে ফিরিবে,—তিনি ভগবানের নাম জপিতে জপিতে সকল অভিযোগ অনুযোগ নীরবে সহ্য করেন।

তাঁহার এ বিশ্বাস সত্ত্বেও কিন্তু সাত দিন কাটিয়া গেল—সুকুমার আসিল না; এমন কি সুকুমারের পিতাকে তিনি আকুল আগ্রহভরে যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার একখানিরও উত্তর পর্য্যন্ত এখনও পাইলেন না।

রবিবার প্রাতঃকালে তাঁহার বিধবা কন্যা শুষ্ক মলিন মুখে নিকটে আসিয়া কহিল—"বাবা জাতকুল যে যায়! আজ মেয়ের বিয়ের দিন, আজ পাত্র ঠিক না করলে আর কবে হবে! তার আশা ছেড়ে দাও।"

বাহিরবাটীর সম্মুখে পাথরবাঁধান নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে একখানা মাদুরের উপর বসিয়া কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন পাশা খেলিতেছিলেন, আর কেহ কেহ নিকটে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন। ভটচাযমহাশয় তাঁহাদেরই পাশে রেল অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া মালা জপিতেছিলেন, এমন সময় কন্যার আবির্ভাবে এবং তাহার মুখের এই কঠোর সত্য কথায় নৈরাশ্যবেদনায় তীব্র সচঞ্চল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"সে কি হয় মা—সে যে নির্দ্দোষ।"

পাশা খেলার একজন দর্শক নিধিরাম চক্রবর্ত্তী হাতের

হুঁকাটি বৈঠকে রাখিতে রাখিতে এই কথাগুলি শুনিলেন, শুনিয়া খেলা দেখার লোভ সম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চানন্দলাভের আশায় অবিলম্বে নিকটে আসিয়া উত্তর-স্বরূপ কহিলেন—"ভটচাযমহাশয় অনেক সময় নির্দ্দোষ লোককেও ত দোষী হতে দেখা যায়।" ভটচায মহাশয় যুবাকালে ন্যায়শাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে সব এখন প্রায় কিছুই মনে ছিল না—তথাপি নিধিরামের যুক্তিটা তাঁহার মনে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যে নির্দ্দোষ সে আবার দোষী হইবে কিরূপে? তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"হতেই পারে না,—সে যে বড় ভালমানুষ।"

"জানেন ভটচায মহাশয়—ভালমানুষ বলেই আরও ভয়! ভালমানুষ লোকই আজ কাল দেশ দেশ করে পাগল, ভালমানুষ লোকই দুষ্টরা যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছে। দেশের নামে—খুন ডাকাতি"—

শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে ভটচায মহাশয়ের ধৈর্য্য রহিল না। তিনি অবিশ্বাসসূচক মাথা নাড়িয়া কহিলেন—ছোটবেলা থেকে জানি যে তাকে,—সে তা নয়।"

"কিন্তু আরও একটা কথা ত ভাবতে হবে। দোষী হোক নির্দ্দোষী হোক হাজতে ত রয়েছে—সকল জাতের ছোঁয়া নাড়া ত খাচ্ছে, জাত ইজ্জত ত আর রইল না—দাগীত বটে!"

ভটচাযমহাশয়ের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল—দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"তবে তোমরা যা ভাল বোঝ তাই করো। কিন্তু—কিন্তু সৎপাত্রই বা কই ?"

তাহার কন্যা কহিলেন "সে আমরা ঠিক করেছি, শ্রীমন্ত বিয়ে করতে রাজি।" ভটচাযমহাশয় আকুল মর্ম্ম ব্যথা বাক্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"শ্রীমন্ত! তার ছেলে, বৌ নাতি নাতনী—সে যে আমার নগেনের চেয়েও বড়! হা ভগবান—নগেনকে তুমি ডেকে নিলে—তার এই দুগ্ধপোষ্য সন্তানটিকে আমার কাছে রাখলে কি আমারি হাত দিয়ে তাকে বলিদান নেবে বলে! মা, ওকথা বলোনা মা,—আমি তা পারব না।"

"কি করবে বাবা—সবই বরাত! আমাকে ত ছেলেমানুষ বরের হাতেই দিয়েছিলে। আমার কপাল পুড়লো কেন বলো! যদি অদৃষ্টে থাকে এতেই সে সুখী হবে। আর দোজবরে বর আদরযত্ন খুব করবে—পয়সা কড়িরও দুঃখ নেই।"

নিধিরাম চক্রবর্ত্তী তাহার মতে সায় দিয়া গেলেন,—"তা বই কি সবই ত কপালের কথা। আর এখন পাঁচটা দেখা শোনারই বা সময় কোথা—মেয়েকে ত আজই পাত্রস্থ করতে হবে, নইলে জাত রক্ষা হয় কই ?"

বৃদ্ধের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে গভীর অনিচ্ছাময় আতঙ্ক ঘূর্ণিপ্রবাহে আলোড়িত হইয়া

উঠিল— কিন্তু তিনি বুঝিলেন, সেই ঘূর্ণিপাকে আজীবন তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকিবে; তথাপি কন্যাকে তিনি অবিবাহিতা রাখিতে পারিবেন না।

অনেকক্ষণ হইতেই রেলগাড়ীর শব্দ হইতেছিল,— এই সময় শব্দটা বাড়িয়া উঠিল, প্রবল শব্দে বাঁশিও বাজিয়া উঠিল। তিনি শেষবার আকুল প্রার্থনা করিয়া সুকুমারের আগমন প্রতীক্ষায় গাড়ীর দিকে চাহিলেন। গাড়ী থামিল, যাহারা নামিবার তাহারা নামিয়া পড়িল, আবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল; হুসহুস শব্দে গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা ভটচায মহাশয়ের বিবর্ণ মুখে জ্যোতি নির্গত হইল। একজন দ্রুতবেগে এইদিকেই আসিতেছে দেখিলেন। কিন্তু সে যখন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধের ঔৎসুক্যপূর্ণ উজ্জ্বল মুখ মুহূর্ত্তে নিরাশমলিন হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি সুকুমার! আমাদের সুকুমার কোথায়? আসছে কি না জান?"

সুকুমারের বাড়ী যাইতে পথের ধারে ইহাঁদিগকে সমবেত দেখিয়া বন্ধু সুকুমার প্রথমে এইখানেই আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভটচায মহাশয়ের প্রশ্নে সবিস্ময়ে উত্তর করিল—"কেন সে কোথা? আজ যে তার বিয়ে?" তখন নিধিরাম এবং ভটচাযমহাশয়ের কন্যা উভয়ে মিলিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা ইনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, সে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল!

কথা শেষ হইলে নিধিরাম বলিলেন "এ বিপদে সুকুমার তুমি যদি রক্ষা কর তবেই বৃদ্ধ দায়মুক্ত হন। জান ত হিন্দুর মেয়ে—তার গায়ে হলুদ পড়ে গেছে—সুকুমার আসুক বা নাই আসুক আজ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—তুমি বিয়ে করলেই জাতকুল বজায় থাকে।"

সুকুমারকে কে যেন সহসা অতল সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া সে যন্ত্রবৎ বলিল—"সে যে আমার বন্ধু"!

"তুমি বিবাহ করিলে বন্ধুতার কাজই হবে। ভেবে দেখ তুমি যদি বিয়ে না কর ত বিয়ে বন্ধ থাকবে না,—আজই মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে,—শ্রীমন্তের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে।"

সুকুমারের হৃদয়ে একটা করুণ শিহরণ উঠিল। তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"সুকুমার, বাবা বাঁচাও—অমত কোরো না। আমি এখনি তোমার মামাকেও ধরে পড়ছি।"

বিধাতাও সুপ্রসন্ন—এই সময় রায়মহাশয় পাশায় জিতিয়া সহাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ভটচাযমহাশয়ের করুণ অনুরোধ বৃথা হইল না,—তখনই দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। তাঁহাকে এই দায় হইতে মুক্ত করা সুকুমারের মামা বন্ধুত্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিলেন! সুকুমার বন্দী হইল।

* * * *

বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ, আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া চলিয়াছে, নীলাম্বরে মেঘকণা নাই, দিক্ বিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্লাবিত; দিগন্ত বেলায় আঘাত করিয়া দক্ষিণানিল সুখতরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোকিল পাপিয়া দ্যুলোক ভূলোক মাতাইয়া কুহুকহু পিউ পিউ তান তুলিয়াছে। বনগ্রামের দুঃখের কথা এখানে যেন আর কাহারও মনে নাই, তাহার অন্তরে বাহিরে দীপ্তি, মধুরতা শত ধারায় আজি উচ্ছ্বসিত। এই আনন্দ পূর্ণিমায় শুভক্ষণে শুভলগ্নে বর সভায় আসিয়া বসিল। এও সুকুমার— কেবল সে দুর্ভাগা সুকুমার নহে।

হায়! ক্ষণ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না— যে তাহাকে ধরিতে পারে সেই সৌভাগ্যবান, যে পারে না—সে হতভাগ্য সকলেরই অবজ্ঞাভাজন, তাহার দুঃখ অধিকক্ষণ কাহারও মনে স্থান পায় না! পরিবর্ত্ত সুকুমার যখন বর বেশে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিল, তখন সমানই আনন্দে উলুধ্বনি উত্থিত হইল, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, পুরবালাগণ সমানই আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে সমাদর করিয়া লইলেন। জামাতাবরণ, স্ত্রী আচার, অঙ্গুরীবিনিময়, মাল্য বদল, শুভদৃষ্টি, সকলের মধ্যেই আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল, লঘুচিত্ত হইয়া প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবে ভটচাযমহাশয় কন্যাসম্প্রদান করিলেন।

বিবাহ মন্ত্র শেষ হইয়া গেলে বরকন্যা অন্তঃপুরে যাইবেন বলিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেই সময় সভাতলে একটা অস্ফুট কানাকানি পড়িয়া গেল। "একি? এই যে সুকুমার! এখন—এত বিলম্বে?" সুকুমার মলিন বিবর্ণমুখে ছায়াখানির ন্যায় স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া বরকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল;—তাঁহারা গ্রন্থিবন্ধনে এক হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন,—সুকুমারের সেই স্বপ্ন মনে জাগিয়া উঠিল। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল:—"স্বপ্ন না সত্য? সত্যই কি আমার চাবি হারাইয়া গেল!"

রক্তপিপাসু

এতদিন তাহাকে খুলিয়া বলি নাই, যে আগুনে নিজে দগ্ধ হইতেছি, যে কথা মনে করিলে—এখনও প্রতিশোধ-আলোড়িত হৃদয়ের অভিসম্পাতরাশি সর্পগর্জ্জনে গরল উদ্গীরণ করে,—সেকথা তাহাকে বলিয়া কেন আর তাহার বালকহৃদয়ের শান্তি অপহরণ করি? যাহা হারাইয়াছি তাহা আর ফিরিয়া পাইব না;—যিনি আমাদের এ দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ তিনিও আজ আমাদের প্রতিশোধের বাহিরে, তবে কেন আর সে সব কথা বলিয়া বংশগত একটা বিদ্বেষভাবে আমার ন্যায় তাহার হৃদয়কেও বিষাক্ত করিয়া তুলি? ইহাতে জগতে কাহারও মঙ্গল নাই। এই ভাবিয়া এতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কোন কথা খুলিয়া বলি নাই, কিন্তু আর না বলিয়া কিছুতেই চলিল না।

আমাদের দেশ আঁধুল, কিন্তু থাকি আমরা দুই ভ্রাতায় কলিকাতায়। আমি চাকরী করি,—সুবোধ স্কুলে পড়ে। যতদিন সুবোধ এণ্ট্রেন্সক্লাশে উঠে নাই, ততদিন তাহার পড়াশুনায় বেশ মন ছিল, এণ্ট্রেন্স ক্লাশে উঠিয়া অবধি তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে

ভূতটি কোন মৃত লোকের অজানিত অশরীরী আত্মা নহে, আমাদেরই জাতিসম্পর্কীয়, জীবন্ত, মূর্ত্তিমন্ত সশরীরী ভ্রাতা কৃষ্ণনাথ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছেন। যেদিন হইতে কৃষ্ণনাথ ওরফে কালু পড়িবার ছুতায় দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া মেসের আশ্রয় লইয়াছে সেইদিন হইতে সুবোধ আর সুবোধ নাই,—তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আগে আফিস হইতে আসিয়াই প্রায় সুবোধকে গৃহে দেখিতাম,—সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবামাত্র টেবিলের নিকট বসিয়া সে পাঠ্যাভ্যাস করিত, শুনিয়া সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া একটা নবীন আশাউৎসাহে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায় বৎসরকাল হইতে আটটা না বাজিলে আর সে গৃহে ফিরে না, কোন কোন দিন আরও বেশী দেরী করে। এত বকি, এত বোঝাই তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না। বেশী রকম উত্যক্ত করিলে বলে,—"পাঁচজনে মিলে পড়ি—তাতে আরও ত পড়া ভাল হয়,—এতে আপনি রাগ করেন কেন? যখন ফেল্ হব—তখন বরঞ্চ বক্‌বেন।"

নিজের ভাইকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না, রাগ করি—কেলে ভূতটার উপর, তাহার নামে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে। বাগে পাইলে ভূত তাড়াইতাম সন্দেহ নাই,—কিন্তু সুখের বিষয় বা দুঃখের বিষয় জানি না—সে

কিছুতে আমাকে ধরা দেয় না। যখনি 'মেসে' তাহার সন্ধানে যাই, শুনি কেলেঙ্গারটা সেখানে নাই।

এই ত আমার অন্তর-বাহিরের অবস্থা,—ইহার পর সত্যই যেদিন শুনিলাম সুবোধ ফেল্ হইয়াছে—সেদিন আমার পক্ষে ধৈর্য্যরক্ষা—আত্মসংযম অসম্ভব হইয়া উঠিল—আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না। হায়! হায়! কে জানিত—ইহার কি পরিণাম! বলিলাম—"আমাদের জ্ঞাতি পিতৃব্য রমানাথ —দেশে যাঁহার কোটা বাড়ী, রূপার বাসন, দেবদেবীর মন্দির, বার মাসে যাঁহার ঘরে তেরো পার্ব্বণ, যাঁহার টাকার জোরে প্রজা জব্দ, রাজা বশ, সেই রমানাথ খুড়া আমাদের রক্ত খাইয়াই মানুষ, আর এই যে তোমার প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণনাথ ইনি সেই নরপিশাচ পাষণ্ডেরই পুত্র। পিতার নখদন্তাঘাতেও আমাদের যেটুকু শোণিত অবশিষ্ট আছে, পুত্র তোমার স্কন্ধে চাপিয়া সেই রসটুক পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিতে উদ্যত। সাবধান হও ভাই সাবধান হও।"

উন্মত্তের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া এই সকল কথা বলিয়া গেলাম,—আমার কথায় সুবোধের যে মনের ভাব কিরূপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তখন ছিল না। নিজের কথা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না, রুদ্ধ উৎস মুক্ত হইয়া এমনি প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিতেছিল।

একটানে কথাগুলি বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইতে যখন থামিলাম—তখন সুবোধ বলিল—"কিন্তু তার কি দোষ—তার কি দোষ!" আমি বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম,—কথাটার অর্থ বুঝিতে একটু সময় লাগিল,—তাহার পর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝন-ঝন করিয়া উঠিল,—ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলাম—"নাঃ তার কিচ্ছু দোষ নেই,—তার বাপ খুনডাকাতী করে ধন এনেছে—সে শুধু আরামে বসে ভোগ করছে বই ত নয়! নরাধম পাষণ্ড, ব্ল্যাগার্ড—"

সে মুখ নত করিয়া নীরব হইয়া রহিল, আমি আপন মনেই বলিয়া চলিলাম,—

"রাস্কেল—! কেবল তাহলেও ত রক্ষা ছিল! আমাদের ধন ভোগ করেই তোমার প্রাণের বন্ধু ক্ষান্ত নন—আমরা যাতে চিরকাল ওদের পায়ের তলায় পড়ে থাকি এই চেষ্টাতে সে তোমার ইহকাল পরকাল খেতে বসেছে। এই সব জেনেশুনে বুঝেসুঝেও যদি তুই তার সঙ্গে মিশতে চাস্ —বেশ—কিন্তু আমার সঙ্গে তাহলে এই পর্য্যন্ত! আর যদি মানুষ হতে চাস্—ত এর প্রতিশোধ কিসে নিবি সেই চেষ্টা কর। তার মনভুলানো কথায়—"

আমার কথা এইখানে থামিয়া পড়িল,—দেখিলাম তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে সেই অশ্রুজলে কি তীব্রবেদনা প্রকাশিত!

মা যখন আমাকে এই সকল কথা বলিতেন, তখন আমার কিরূপ যন্ত্রণা হইত মনে পড়িল—বুঝিলাম সুবোধের হৃদয় আজ সেইরূপ যন্ত্রণায় আলোড়িত—সেইরূপই প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রজ্বলিত আর এই মানসিক সংগ্রামে বন্ধু কৃষ্ণনাথকে সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহাতে তাহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা!

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনের অবস্থা আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তাহার যন্ত্রণা নিজের মত করিয়াই হৃদয়ে অনুভব করিলাম, মনটা ব্যথিত, ব্যাকুল হইয়া পড়িল;—কিন্তু না—এ যন্ত্রণা হইতে তবুও তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না,—এ কষ্টই তাহার পক্ষে মঙ্গল;—সুদৃঢ় ভাবে বলিলাম—"পিতার যে কর্ম্মফলে পুত্র আজ তাহার ধনসম্পদের অধিকারী—সেই কর্ম্মফলে আমাদেরও সে ঘৃণার ভাজন। যদি তুমি মানুষ হও—ত, তাকে পিশাচবোধে তার সঙ্গ ত্যাগ কর।"

দেখিলাম তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—বুঝিলাম কথার ফল ধরিয়াছে—হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভব করিলাম।

(২)

আহা এই চালটা যদি আগে চালিতাম—তাহা হইলে আর সুবোধ এণ্ট্রেন্সে ফেল হইত না! বড়ই আপশোষ রহিয়া গেল। সেই কথা বলার পর হইতে সুবোধ

এখন একেবারেই সুবোধ বালক,—বাড়ী ফিরিতে প্রায়ই বেশী দেরী করে না, পড়াশুনাতেও অসম্ভব রকম মন দিয়াছে। যখনই তাহার ঘরে যাই দেখি বই হাতে লইয়া সে বসিয়া আছে। এতটা বাড়াবাড়ি বরঞ্চ আমার ভাল লাগে না—একটু Recreation—আমোদ প্রমোদ খেলাগল্পও ত দরকার,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা বলিতে সাহস হয় না—আবার পাছে দলে ভিড়িয়া পড়ে। ঘরে ব্যায়াম করিতে উৎসাহদানের জন্য একসেট স্যাণ্ডো কিনিয়া দিয়াছি,—বারান্দায় 'বার টাঙ্গাইয়া' দিলাম,—কিন্তু তাহাতে বড় একটা ফল হইল না, কেবল বৃথা অর্থ নষ্ট। আর এক উপায় অবলম্বন করিলাম, দুই চারিখানা বাঙ্গলা মাসিক পত্রের গ্রাহক হইলাম—পাঠ্য-পুস্তক পাঠের অবসরে সময় সময় এ সকল পড়িলে মাথার একটু বিশ্রাম হইবে। আফিসের ফেরতা একদিন কয়েকখানা উপন্যাসও কিনিয়া আনিলাম। সেদিন সুবোধ তখনও গৃহে ফিরে নাই। সন্ধ্যায় যখন সে বাটী আসিল, তখন আমি আফিসের যে একরাশ কাজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম—তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ;—তাই তৎক্ষণাৎ আর তাহাকে উপন্যাস কথানি দেওয়া হইল না। কার্য্য শেষে তাহাকে বই কথানি দিতে গিয়া দেখিলাম—প্রতিদিনের ন্যায় টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া সে পাঠ্যপুস্তকে নিমগ্ন রহিয়াছে—বড়ই মনটা আর্দ্র হইয়া

উঠিল, বেচারার আমোদ আহ্লাদ—গল্পগুজব—সবই আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি!—ডাকিলাম 'সুবোধ!' সে আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল। নিকটে আসিয়া বইখানা তুলিয়া দেখিলাম—সেখানি কোন পাঠ্যপুস্তক নহে, একখানা বাঙ্গলা নাটক—নাম প্রকৃত প্রতিশোধ। মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল,—চাহিয়া দেখিলাম টেবিলটা বাঙ্গলা বহিতে ভরা—আশ্চর্য্য! এতদিন এগুলা নজরে পড়ে নাই!

উপন্যাস কখানা টেবিলে রাখিয়া বলিলাম, "তোমার ত বাঙ্গলা বই অনেক আছে দেখছি"?—সুবোধ বলিল—"হ্যাঁ--যখন পাঠ্য পুস্তক গুলো পড়তে পড়তে মাথাটা বিগড়ে ওঠে—তখন মাঝে মাঝে কোনখানা পড়ি।"

সে ত বেশ কথা! আমি ত তাই চাই! মনটা তখন হালকা হইল। এই সময় আমাদের আফিসের বড় বাবু—মিষ্টার মজুমদার—হঠাৎ পিঠে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন--"হ্যাল্লো—এখানে কি হচ্ছে? সুবোধের পড়ার তদারক হচ্ছে বুঝি? একি--টেবিল যে রাবিশে ভরা!" বলিতে বলিতে বাঙ্গলা বই—দুএকখানা হাতে তুলিয়া আবার দুমদাম শব্দে সেগুলি টেবিলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"Vary bad—very bad—এই সব রাবিসে মাথা ভরাট করলে এবারও তুমি নিশ্চয় ফেল্ হবে—

দেখছি। কান্তি বাবু যদি ভাল চান একে এসব জিনিষ ছুঁতে দেবেন না—বুঝলেন ত?”

মজুমদার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ অ্যান্টি স্বদেশী—তাঁর উপদেশ গ্রহণ করিবার পাত্র আমি নই। আমাদের মনে যতটুকু তেজ, যতটুকু ঔদ্ধত্য সবই স্বদেশীর ফল, বাঙ্গালী যে এমন খুনাখুনী করিতে পারে—কিছুদিন পূর্ব্বে কে তাহা বিশ্বাস করিত! আমি তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া আসিলাম।—তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন,—কাল আফিসে বড় সাহেব আসিবেন—যেন একটু সকাল সকাল সেখানে যাই।

(৩)

আমার ভাবিবার বিষয় অন্য বড় কিছু নাই; কাজ কর্ম্মের অবসরে সুবোধই আমার মনের সব স্থানটা জুড়িয়া বসে। সেদিন রাত্রিকালে যখন শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তখন একে একে তাহার সম্বন্ধে সেদিন-কার সমস্ত কথাই মনে হইতে লাগিল। আমি দেখিয়াছি রাত্রির নিস্তব্ধতায়—খুব ছোট জিনিষও বেশ বড় অক্ষরে মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

সেই বইখানির নাম প্রকৃত প্রতিশোধ! কি রকম আগ্রহের সহিতই সে বইখানি পড়িতেছিল! আমি যখন

গৃহে প্রবেশ করি—সে জানিতেও পারে নাই; যখন ডাকিলাম কিরূপ চমকিত ভাবে বইখানি সে মুড়িয়া রাখিল! কেন এরূপ ভীত ভাব? এত গোপনতা কিসের? সত্যই কি তার মনে এতই প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলিয়াছে যে এইরূপ বই পড়িতে পড়িতে সে একেবারে তন্ময় হইয়া উঠে! মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল; এইরূপ দুশ্চিন্তার মধ্যে কখন যে নিদ্রাদেবী আশ্রয় দান করিলেন—বুঝিতেও পারিলাম না।

পরদিন বড় সাহেব অফিসে আসিবেন—তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম্ম গুছাইয়া লইয়া আফিসে চলিয়া গেলাম। সাহেব চলিয়া যাইবার পর সেদিন বেশ সকাল সকাল ছুটিও পাইলাম। পরদিন হইতে পূজার ছুটি আরম্ভ,—বেশ একটা স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম।

সুবোধের তখনও বাড়ী ফিরিবার কথা নহে, কিন্তু বাড়ী আসিয়া দেখিলাম—সুবোধের ঘরের দ্বার বন্ধ আর ভিতরে যেন কি একটা কলহ বিবাদ হইতেছে! দ্বারদেশে কর্ণপাত করিয়া শুনিলাম, সুবোধ বলিতেছে—"দুরাচার—দুর্ব্বৃত্ত—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!" সঙ্গে সঙ্গে একখানা তরবারি ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূমিতে আহত হইল। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—বুঝিলাম সত্যই সে রক্তপিপাসু—প্রতিশোধ লইতে উন্মত্ত—আর আমিই তাহাকে এইরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছি! আশঙ্কায়, অনুতাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া

উঠিল ;—ডাকিলাম, "সুবোধ সুবোধ" ;—মুহূর্ত্তে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল কিন্তু দ্বার যেমন বন্ধ তেমনিই রহিল। আমি দ্বারে করাঘাত করিলাম—তথাপি দ্বার খুলিল না—কেবল ত্বরিতগতি পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম—অন্য দ্বার দিয়া সুবোধ বাহিরে চলিয়া গেল। আমি ঘুরিয়া সেই দ্বারপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম গৃহে কেহই নাই। এইমাত্র যে একখানা তরবারির ঝন্ ঝন্ শুনিলাম সেখানাই বা কোথায় ? তবে সেখানাও দেখিতেছি সে হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ কি ! মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখনই কৃষ্ণনাথের বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম,—তাহাকে সাবধান করা একান্তই প্রয়োজন হইয়াছে—একথা আমার অন্তরাত্মা বার বার করিয়া বলিতে লাগিল। তাহার বাসায় গিয়া শুনিলাম সে দেশে গিয়াছে, শুনিয়া মনটা একটু আশ্বস্ত হইল। বাড়ী ফিরিয়া সুবোধের অপেক্ষায় রহিলাম। সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিবেই জানিতাম—কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—সুবোধ আসিল না ; আহারের সময় উপস্থিত হইল সুবোধ আসিল না—রাঁধুনীকে, বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সুবোধ কিছু বলিয়া গিয়াছে কি না ? তাহারা বলিল—'না !' আবার কৃষ্ণনাথের মেসে গিয়া, পাড়ার অন্য দুএক জায়গায় গিয়া খোঁজ করিলাম, কোথাও সুবোধের সন্ধান মিলিল না। ইহার পর চাকরদের অব্যাহতি দিবার জন্য আহারে

বসিলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য সে রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হইল না। প্রাতঃকালেও সুবোধ বাড়ী ফিরিল না—১০টা বাজিয়া গেল সুবোধের দেখা নাই—মন অস্থির হইয়া উঠিল হঠাৎ মনে হইল নিশ্চয়ই সুবোধ কৃষ্ণনাথের উদ্দেশে দেশে গিয়াছে—হয়ত—হয়ত সেই তরবারী এতক্ষণে তাহারি রক্তে প্লাবিত; আমি বাধা দিব বলিয়া আমাকে লুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমি পাগলের মত হইয়া উঠিলাম। একটা ছোট মনিব্যাগ মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ ট্রেন ধরিতে ছুটিলাম। কি ভাগ্য এখন ছুটির দিন!

ষ্টেসনে গাড়ী থামিল ঠিক ৫টায়। নামিয়াই কাকার বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। উন্মত্তের মত ছুটিলাম, আশে পাশে কে আছে বা না আছে কে আমাকে দেখিতেছে বা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে—সে সব দিকে একেবারেই লক্ষ্য নাই —আমি কেবল হন হন করিয়া ছুটিয়াছি। আমাদের বাড়ী যাইতে ডান হাতি একটা ছোট জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্য দিয়া গেলে একটু শীঘ্র যাওয়া যায়। আমি দ্রুতপদে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম; কিন্তু এ কি! সুবোধের কণ্ঠ না? সেই ভীষণ চীৎকার—"দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড"! উৎকর্ণ, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাই! আর সন্দেহ নাই, সত্যই সুবোধ এক হাতে কৃষ্ণনাথকে ধরিয়া অন্য হাতে তরবারী ঘুরাইয়া চীৎকার করিতেছে "দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড, এই নে প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

বাল-পাঠ্য পুস্তক

সচিত্র বর্ণবোধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ … ৵০

প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ … … ৵০

স্বল্প প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (সচিত্র) … ।০

ন্যবিনোদ … … ৶০

র্ত্তিকলাপ (সচিত্র) … … ।৵০

কীর্ত্তিকলাপে বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামমোহন রায়, বদ্যাসাগর প্রভৃতি আমাদের দেশের বড়লোকদিগের জীবনী আছে।

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত

১। বৈশাখ হইতে ভারতীর বর্ষারম্ভ। সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ লেখকলেখিকাগণের রচনায় এবং নানা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বিষয়ে ও বহু চিত্রাদিতে

ভারতীর শতাধিক পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র
তিন টাকা ছয় আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

৩ সানি পার্ক, বালিগঞ্জ—কলিকাতা।